মাধুকরী

মাধুকরী

কবিশেখর, শ্রীকালিদাস রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৩৬১

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : শোভন সংস্করণ ৬'০০

মুদ্রাকর
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কবি ও কাব্যের পরিচয়

এই পুস্তকে বড়ু চণ্ডীদাস হইতে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সুদীর্ঘ পরিসরের নির্বাচিত নিদর্শনগুলি যতদূর সম্ভব কালানুক্রমে সংকলিত হইল। প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে আনুক্রমিক যথাযথতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বলা বাহুল্য, ইহাতে যুগ-প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিদের রচনাই নির্বাচন করা হইয়াছে। লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, কোন স্তর, কোন ধারা, কোন গোষ্ঠীর রচনার নিদর্শন যেন বাদ না পড়ে। নির্বাচনে রসবৈচিত্র্য, বিষয়-বৈচিত্র্য, ছন্দো-বৈচিত্র্য, রচনাভঙ্গীর বৈচিত্র্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। জীবিত কবি এখন শত শত, তাঁহাদের সকলের রচনার নিদর্শন-সমাবেশ পুস্তকের অল্প পরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাধন-ভজনের গুহ্য তত্ত্বের বাহন চর্যাপদগুলির কবিত্বের দিক হইতে কোন মূল্য নাই বলিয়া বড়ু চণ্ডীদাস হইতে বাংলা কাব্যের সূত্রপাত ধরিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে সংকলিত পদ দুটিকে পদাবলী সাহিত্যের প্রাথমিক স্তরের নিদর্শন মনে করা যাইতে পারে।

কৃত্তিবাসের নিজস্ব ভাষায় রচিত সেকালের রামায়ণের পুঁথি পাওয়া যায় না, পরবর্তী কালের দুই-একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির ভাষাও সহজবোধ্য নয়। বর্তমান কালে প্রচলিত রূপান্তরিত পাঠ হইতে দুইটি নিদর্শন সংকলনে গৃহীত হইল। 'গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণনা'র ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

চণ্ডীদাস একাধিক কিনা এবিষয়ে মতদ্বৈধ থাকায় চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর নিদর্শন স্বতন্ত্র ভাবে সংকলিত হইল। চণ্ডীদাসের

পদাবলী ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া ভাষার প্রাচীনতা হারাইয়াছে। চণ্ডীদাসই পদাবলী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। গভীর হৃদয়াবেগের আকূতি আবেদন তাঁহার পদাবলীর কবিধর্ম। রচনার ভাষা স্বচ্ছ, সরল, নিরাভরণ হইলেও একেবারে অলংকারবর্জিত নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'প্রেমের তুলনা' পদটির উল্লেখ করা চলে। গভীর আন্তরিকতা ও মর্মস্পর্শিতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী অতুলনীয়।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর (বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত তাঁহার পদাবলীর) ভাষার নাম ব্রজবুলি। এই ব্রজবুলি চর্যাপদের ভাষার চেয়ে বাঙালীদের পক্ষে সহজবোধ্য। সেজন্য বাঙালী কবিদের মধ্যেই বিদ্যাপতিকে ধরা হয়। ইঁহার পদাবলীতে ছন্দোবৈচিত্র্য, আলঙ্কারিক কলাচাতুর্য, সংস্কৃত কবিদের প্রভাব ও হৃদয়াবেগের সহিত রচনাপারিপাট্যের অপূর্ব সম্মিলন লক্ষণীয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত শ্রীকৃষ্ণচরিতের কাব্য ধারা পদাবলী ধারার পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় এই ধারার প্রথম কাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি' তাহা হইতে সংকলিত একটি অংশ। এই ধারাকে সাধারণতঃ 'গোবিন্দ মঙ্গল-কাব্য-ধারা' বলা যাইতে পারে।

ছোট বড় দেবদেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক মঙ্গলকাব্য-ধারাও ইহার পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। এইগুলিতে কোন-না-কোন দেবদেবীর মহিমা-কীর্তন-মূলক পয়ার ত্রিপদী ছন্দে লিখিত কবিতাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। এই দেবদেবীদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম দেবতাই প্রধান। এই গ্রন্থে বরিশালনিবাসী কবি বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল হইতে দুইটি অংশ গৃহীত হইয়াছে।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার জীবৎ-কাল হইতেই পদাবলীর ধারা রসের প্রবাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে! তাঁহার জীবদ্দশায় যে কবিরা পদাবলী রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ ও রায়

রামানন্দ। ইঁহাদের মধ্যে রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের লোক, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান অমাত্য ছিলেন। ব্রজবুলিতে রচিত ইঁহার একটি বিখ্যাত পদ সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর পদাবলীর দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিতে থাকে। একটি, বিদ্যাপতি-প্রবর্ত্তিত ব্রজবুলির ধারা, অন্যটি চণ্ডীদাস-প্রবর্ত্তিত খাঁটি বাংলা ভাষার ধারা। প্রথম ধারার শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বলরাম দাস। দ্বিতীয় ধারার শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, লোচন দাস ইত্যাদি। জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস দুই ধারারই কবি। প্রথম ধারার কবিরা প্রাকৃত ভাষার পৈঙ্গলিক ছন্দে অর্থাৎ জয়দেবী ছন্দে আলঙ্কারিক অনুক্রমে ও দ্বিতীয় ধারার কবিরা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে আবেগাত্মক অনুক্রমে পদ রচনা করিতেন।

প্রথম ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস। রচনার চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কাহারও রচনায় নাই।

ইঁহার পর রায়শেখরের নাম করা যাইতে পারে। 'বর্ষাভিসার' ও 'বর্ষাবিরহ' পদ দুইটি বিদ্যাপতির নামে চলে, কিন্তু এই দুইটি পদ রায়শেখরের। বলরাম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণের বারমাসিয়া' পদটি রচনা-চাতুর্যের অপূর্ব নিদর্শন।

দ্বিতীয় ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসের খাঁটি বাংলায় রচিত পদগুলিই অধিকতর মর্মস্পর্শী। নরোত্তম দাসের প্রার্থনার পদগুলিতে ও লোচন দাসের সখী-ভাবাশ্রিত চল্‌তি ভাষায় রচিত পদগুলিতেই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। পদাবলীর বাক্যপরম্পরায় ত্রিবিধ অনুক্রম দেখা যায়। চণ্ডীদাসের ও জ্ঞানদাসের অধিকাংশ পদের অনুক্রম আবেগাত্মক (Emotional), গোবিন্দ দাসের পদের প্রধান অনুক্রম আলঙ্কারিক (Rhetorical), চম্পতির পদের অনুক্রম যুক্তিমূলক (Logical)।

যদুনন্দন দাস বৈষ্ণবাচার্যদের সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে রূপান্তরিত

করিয়া পদের আকার দান করিতেন। সংকলিত পদটি রূপগোস্বামীর একটি শ্লোকের পদরূপ। রাধামোহন ও জগদানন্দ বিদ্যাপতি-প্রবর্ত্তিত ধারার কবি। জগদানন্দ শব্দালঙ্কারের সুদক্ষ মণিকার ছিলেন।

পদাবলীর দুইটি ভাগ—ব্রজলীলা ও নদীয়া লীলা। দুই লীলার পদই সংকলনে গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিত-সাহিত্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের পৃথক একটি ধারা। এই ধারার প্রধান কাব্য বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বকার নবদ্বীপের সামাজিক জীবনের পরিচয় প্রথম গ্রন্থখানি হইতে, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিচার (গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব) দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতে এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসিয়া (গৌরাঙ্গ বারমাসী) তৃতীয় গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

পদাবলীর যুগে শ্রীমদ্‌ভাগবত অবলম্বনে রচিত অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়, তন্মধ্যে দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল একখানি। বর্ষার বর্ণনা তাহা হইতে গৃহীত।

পদাবলীর যুগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আবির্ভাব হয়। কবি-কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পৌরাণিক শাখা হইতে একটি অংশ, কালকেতুর কাহিনী হইতে একটি অংশ এবং শ্রীমন্ত-ধনপতির কাহিনী হইতে একটি অংশ গ্রহণ করা হইল।

পদাবলীর বারমাসিয়া শুধু বিরহের বর্ণনা, মঙ্গলকাব্যে প্রধানতঃ দুঃখ-দারিদ্র্যের বর্ণনা। কবিকঙ্কণের কাব্যে খুল্লনার বার-মাসিয়ায় বিরহজনিত দুগতির সঙ্গে সপত্নী-লাঞ্ছনা সংযুক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ-সাহিত্যের ধারায় পদাবলীর যুগে ভাগবতের বিবিধ অঙ্গের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অনুবাদ হইয়াছিল—তন্মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত সর্বজনবল্লভ। প্রাচীন যুগের অনুবাদ সাহিত্য আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ কিংবা মূলের আখ্যানাংশ লইয়া রচিত অভিনব কাব্য।

এই যুগে রচিত ধর্মমঙ্গল-কাব্যধারায় ঘনরামের ধর্মমঙ্গল হইতে দুটি অংশ এবং মনসামঙ্গল ধারার ক্ষমানন্দ-কেতকাদাসের মনসামঙ্গল হইতে একটি অংশ সংকলিত হইয়াছে।

রামেশ্বরের শিবমঙ্গল বা শিবায়ন হইতে যে অংশ গৃহীত হইয়াছে তাহাই আগমনী-বিজয়া গানের মূল কথা।

ইহার পর লোকসঙ্গীতের প্রাধান্যের যুগ। এই লোকসঙ্গীত ধারার অঙ্গীভূত পূর্ববঙ্গগীতিকা, শাক্ত সঙ্গীত, বাউলগীতি, পাঁচালী গান, কবির গান, যাত্রা গান ইত্যাদি। এই যুগের সঙ্গীত-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ। তাঁহার গীতাবলীর সুরকে বলা হয় 'রামপ্রসাদী', তাঁহার ভাষাকেও রামপ্রসাদী ভাষা বলা যাইতে পারে। বাংলা দেশে কাব্যসাহিত্যে চল্‌তি ভাষার প্রবর্ত্তন হইল তাঁহার ভাষা হইতেই। রামপ্রসাদের আগে লোচনদাস চল্‌তি ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদী পদগুলির মতো সেগুলির প্রচার ছিল না। প্রসাদী গানের চলতি ভাষার উপযোগী ছন্দই বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ছন্দের কোন নামকরণ হয় নাই,—ইহাকে রামপ্রসাদী ছন্দ বলা যাইতে পারে।

গ্রাম্য লোক-সঙ্গীতের যুগে নাগরসাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র। তাঁহার রচিত অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য-ধারার শেষ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে পৌরাণিক চিত্রের সহিত ঐতিহাসিক চিত্র ও প্রাকৃত জীবনচিত্রের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের ভাষা পরিচ্ছন্ন, কলাশ্রীমণ্ডিত, 'যাবনীমিশাল' ও পবিহাসবিজল্পিত। পাঁচালী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি। দাশরথি পাঁচালীর বৃন্দাবনকে রাঢ়দেশের গোয়ালা-পাড়ায় টানিয়া আনিয়াছেন।

ঈশ্বরগুপ্ত বর্ত্তমান যুগ-প্রভাতের ভোরের পাখী। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার রচনায় সঞ্চারিত হয় নাই,—কিন্তু ইংরাজ সমাজের আচার আচরণ এবং সামসময়িক রাজনীতি তাঁহার কাব্যে রঙ্গরসের উপাদান যোগাইয়াছে। তাঁহার রচনায় স্বদেশ, স্বভাষা ও

স্বধর্ম্মের প্রতি ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ প্রতিফলিত হইয়াছে।

গুপ্ত কবির পর বঙ্গ-সরস্বতীর একশতাব্দীব্যাপী সুপ্তির অবসান হয়। মধুসূদন গাহিলেন প্রভাতী।

মধুসূদন পাশ্চাত্য উপবন হইতে বিন্দু-বিন্দু মধু সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের কুঞ্জবনে মধুচক্র রচনা করিয়া গুঞ্জরণ সুরু করিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মেঘনাদবধে বিবিধ রসের সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার ভাষা, রচনা-ভঙ্গী, ছন্দ, ভাবাদর্শ সবই তাঁহার স্বকীয়, জীবনী-শক্তির আতিশয্যে উচ্ছল। তাঁহার রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্মেলন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিযানে নবপ্রবুদ্ধ জাতিকে দেশাত্মবোধে দীক্ষাদানের ভার লইলেন রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। রঙ্গলাল রাজপুতনার ইতিহাস অবলম্বনে দেশভক্তি-মূলক কাব্য রচনা করিলেন। হেমচন্দ্র নানা কবিতায় শিঙা বাজাইয়া উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেন। নবীনচন্দ্র বাংলার অদৃষ্ট-বিপর্যয় অবলম্বনে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য রচনা করিয়া স্বদেশের প্রতি জাতীয় অনুরাগ উদ্দীপিত করিলেন। হেমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বৃত্রসংহার, তাহাতে পশুবলের সহিত তপোবলের সংগ্রামে তপোবলের বিজয় লাভই আসল উপজীব্য। বৃত্রসংহার হইতে সংকলিত অংশটিতে মেঘনাদবধের সীতা-সরমা-সংবাদের মতো গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইতেছে। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল মহাকাব্যের (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই তিন কাব্যের সমবায়) মূলতত্ত্বটি সংকলিত করা হইল।

দীনবন্ধু নাট্যকার নামেই সুপরিচিত; কেবল সুরধুনী কাব্য নয়, দুই চারিটি গীতি-কবিতাও তাঁহার আছে— যেমন এই গ্রন্থে সংকলিত সূর্য (আংশিক)। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের গানটি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উদ্গীত হইত। ব্রহ্মসঙ্গীতের নিদর্শনস্বরূপ গানটি সংকলিত হইল।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী গীতিকবিতার নূতন

সুর প্রবর্তিত করেন। রবির উদয়ের আগে তিনি শুকতারা; ভোরের পাখীও বলা যায়। কারণ, ভোর না হইতেই তিনি ভোরের খবর রাখিতেন। সারদামঙ্গল ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। সারদা তাঁহার কবিজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

মহিলাকাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীত্বের মহিমা প্রচার করিয়াছেন—তাঁহার মাতৃপ্রশস্তির কিয়দংশ সংকলিত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের যমুনালহরী চৌপইয়া ছন্দে রচিত—ঐতিহাসিক-স্মৃতিবিজড়িত। বহুকাল পরে এই ছন্দ বাংলা ভাষায় তাঁহার রচনায় আবার বাণীরূপ লাভ করিল। স্বপ্নপ্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অলকাপুরী মেঘদূতের উত্তর-মেঘের কিয়দংশের অনুবাদ। সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ হিসাবে ইহার মূল্য আছে। রঙ্গলালকৃত কুমার-সম্ভবের অনুবাদের কিয়দংশ পূর্বেই সংকলিত হইয়াছে।

তারপর 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।' এই পর্বতচূড়াকে ঘিরিয়া—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

ঐ পর্বত চূড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা। তাহা হইতে বহু বিচিত্র কাব্যধারা বিগলিত হইয়াছে। আমি পাঁচটি ধারার পাঁচটি কবিতা নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি।

বিশ্বভারতী ঐ পাঁচটি কবিতা সংকলনে গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে চিরঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অল্প কথায় কবিতাগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের সামসময়িক কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দ দাস অবলম্বিত হৃদয়াবেগের কবি—ইঁহাদের রচনা অমিত্ত ভাষণে উচ্ছ্বসিত। দেবেন্দ্রনাথ গার্হস্থ্য জীবনের, গোবিন্দ দাস পল্লী-

জীবনের ও দরিদ্র সংসারের চিত্রকর। উভয়ের রচনায় জীবনী-শক্তির আতিশয্য লক্ষিত হয়। তাঁহাদের বিপরীত ধারায় কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁহার ভাষণের উপর ছিল কঠোর শাসন। কেবল বাগ্‌বিন্যাসে হয়—হৃদয়াবেগেও ছিল সংযম। সেজন্যই শোক-কবিতার সংগ্রহ হইলেও তাঁহার 'এষা' শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অক্ষয়-কুমার বিহারীলালের শিষ্য, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গুরুর কাছ হইতেই তিনি পাইয়াছেন। ইঁহাদের তিনজনেরই স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিন-জনই প্রেমের কবি, প্রথম দুইজনের কাব্যে প্রেমের আবেগোচ্ছলতা ও তৃতীয় জনের কাব্যে প্রেমের গাঢ়তা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি সুরের মৌলিকতা ও মর্মস্পর্শিতার জন্য জনবল্লভ; অধিকাংশ গান নাটকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যঙ্গ-কৌতুকাবহ কবিতারচনায় ইনি অদ্বিতীয়। গীতি-কবিতাতেও স্বকীয়তা বিদ্যমান। কোন রচনায় অস্বচ্ছতা, জটিলতা, কৃত্রিমতা বা আলঙ্কারিক আতিশয্য নাই। রজনীকান্তও গানের কবি এবং রঙ্গরসের স্রষ্টা। প্রাচীন সঙ্গীতের ধারাকে কবি নবীভূত করিয়াছেন।

এযুগের চারিজন মহিলা কবির মধ্যে মানকুমারীর রচনা অমিত-ভাষিণী এবং হৃদয়োচ্ছ্বাসের পক্ষপাতিনী। কামিনী রায়ের হৃদয়াবেগে সংযম থাকিলেও রচনায় মাধুর্যের অভাব নাই। গিরীন্দ্রমোহিনীর চিত্রাঙ্কনী শক্তির খ্যাতি আছে, প্রিয়ংবদার রচনা গাঢ়বন্ধ।

প্রমথ চৌধুরী সর্বাঙ্গসুন্দর সনেটের কবি। ভুজঙ্গধর তত্ত্বমূলক ও ধর্মমূলক কবিতার লেখক, ইঁহার রচনায় ছন্দোবৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ শিষ্য দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বিশেষভাবে প্রেমের কবি। রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে রমণীমোহনের সহজ সরল নিরাভরণ ভাষায় রচিত কবিতাগুলি ছাত্র-পাঠ্যরূপে সুপরিচিত।

রবীন্দ্র-শিষ্য করুণানিধান স্বপ্নরসিক রোমান্টিক কবি। বিষয়-বস্তুর স্বপ্নরূপ ও রচনার ব্যঞ্জনাগর্ভতা তাঁহার কবিতাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। রবীন্দ্র-শিষ্য যতীন্দ্রমোহনও একজন রোমান্টিক

কবি। স্বদেশ-প্রেম, বাংলার প্রকৃতি, বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন ও গ্রাম্য জীবন ইঁহার রচনায় সুপরিচ্ছন্ন বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রশিষ্য কুমুদরঞ্জনকে লোকে পল্লী-কবি বলিয়াই জানে; কিন্তু তিনি যে বহু বিচিত্র ভাবের কবিতা লিখিয়াছেন—এই সংকলনেই তাহার কিছু পরিচয় মিলিবে।

রবীন্দ্রশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যৎসামান্য। ছন্দের যাদুকর বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তাঁহার কবিকল্পনা যে কত বিচিত্র পথে ধাবিত হইয়াছে—তাহার সন্ধান অনেকেই রাখেন না। নিজেকে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য বলিয়া তিনি গৌরব বোধ করিতেন এবং কবিগুরুর ভক্তদের ইষ্ট-গোষ্ঠীকে তিনি বলিতেন 'গন্ধরাজের পরিমলমণ্ডল'। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার উপজীব্য পৌরাণিক, বৈদিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনীতিক ইত্যাদি নানা বিষয়বস্তু। 'বৈকালী' একটি অবিমিশ্র গীতি-কবিতা।

কিরণধন ঐ গন্ধরাজের পরিমলমণ্ডলের একজন মধুকণ্ঠ মধুকর। তাঁহার দাম্পত্য প্রেমের কবিতাগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সংকলিত কবিতাটিতে প্রিয়া-বিয়োগের বিধুরতা সুপরিচ্ছন্ন কারুণ্যঘন বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

জীবন ও ভুবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছেন যতীন্দ্রনাথ। তাহাও একপ্রকার রবীন্দ্র প্রভাবেরই সঞ্চার ও সক্রিয়তা। সখ্য বাৎসল্যের মতো অনুকম্পা-কেও ভক্তিমার্গের একটি রস-স্তর বলিয়া স্বীকৃতি প্রাচীন বাংলার শৈব সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাঁহার 'ভিখারী দেব' কবিতায়। 'লোহার ব্যথা'র কর্মকার ঈশ্বর। লোহা—জীব।

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ রবীন্দ্র-শিষ্যগোষ্ঠীর একজন কবি। ইনি বাদশাজাদী জেবউন্নিসার সুফী ভাবের কবিতাগুলির এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইগুলির অনুবাদ করেন।

মোহিতলালও রবীন্দ্র-শিষ্যগোষ্ঠীর অন্যতম। অনেকের মতে

গণ্যতন্ত্র কবি। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন তাঁহার কবিতায়; মোহিতলালও সমন্বয়বাদী কিন্তু তিনি দেহাত্মকতার দুর্নিবারতাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কালাপাহাড় —যুগ-সত্যের প্রতীক (Symbol)। কবিতাটি অবাস্তব দৈবভয়ের উপর মানবতা ও পুরুষকারের প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহ্বান। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ যে কথা ইঙ্গনায় ব্যঞ্জনায় বলিয়াছেন, পৌত্তলিক হিন্দু-সমাজের কবি মোহিতলাল নিরঙ্কুশ ভাবে তাহাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন।

হেমেন্দ্রকুমার রবিপরিমণ্ডলের একজন রোমান্টিক কবি। 'কয়েদী' 'বনের বাঘা' বিপুল শক্তিশালী অথচ আত্মবিস্মৃত পরাধীন মানুষের প্রতীক।

নরেন্দ্রদেবও ঐ পরিমণ্ডলের কবি। রসলক্ষ্মী কবিতাটির উদ্দিষ্টা কল্পনার চিন্ময়ীও হইতে পারেন—বাস্তব জীবনের শরীরিণীও হইতে পারেন।

মনসামঙ্গলে খণ্ডকপালী বেহুলার বিশেষণ। বিখণ্ডিত বঙ্গ-ভূমির ও বেহুলার কপাল একই—কবিতার মধ্যেই তাহা বলা হইয়াছে—

খণ্ডকপালী চিরবাঞ্ছিতে লভিলে গভীর রাতে,
গাঙ্গুড়ের ভেলা প্রান্তে'

'কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহার' কালিদাসের দুইখানি কাব্য। যোগমগ্ন মহাদেবের তপোবনে অকাল বসন্তের আবির্ভাব হইতে কুমারের জন্ম পর্যন্ত হরগৌরীলীলাকে ছয়টি ঋতুতে সমারোপিত করা হইয়াছে। লেখকের ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গীর রচনার নিদর্শন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবধারাকে বাংলা কবিতায় ছন্দোমাধুর্যে ও সুললিত পরিচ্ছন্ন ভাষায় নবরূপ দান করিয়াছেন সুপণ্ডিত কবি সুশীলকুমার দে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তাহার সামান্য নিদর্শন।

যতীন্দ্রপ্রসাদ একজন প্রখ্যাত ছন্দঃশিল্পী ও রোমান্টিক কবি। 'সম্ভোগ' কবিতার মর্মকথা শেষ দুই চরণেই অভিব্যক্ত।

কবি অরীন্দ্রজিৎ বৈদিক সূক্তগুলিকে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। উষা সূক্ত তাহার একটি চমৎকার নিদর্শন।

দিলীপকুমার বহুধা-বিখ্যাত কবি, সুরকার, কথাসাহিত্যিক, সুর-শিল্পী ও ভক্তসাধক। তাঁহার রচিত দুইটি গান সংকলিত হইল।

দেশভক্তিমূলক কবিতা রচনার জন্য সাবিত্রীপ্রসন্নের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। চিরদিনকার গৃহ-সংসার হারাইয়া বাস্তুহারা গৃহস্থ তাহার একটা সামান্য অনুকল্প মাত্র রচনা করিয়া নূতন করিয়া জীবনযাত্রার সূত্রপাত করিয়াছে, 'পুনর্বাসন' কবিতায় তজ্জনিত উদার সন্তোষমধুর পরিতৃপ্তির সুরটি ধ্বনিত হইতেছে।

কৃষ্ণধন দে বর্তমান যুগের একজন অগ্রগণ্য রোমান্টিক কবি। 'বেদে' কবিতায় বেদেদের যাযাবরী জীবনযাত্রাটি পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তাহার চলন্ত সংসারটিও যেন জীবন্ত হইয়াছে।

রচনার পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য ও অনয়ত্নতা সাধনে সুদক্ষ শিল্পী কৃষ্ণদয়াল বসুর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি সংযত হৃদয়াবেগের গভীর আন্তরিকতায় অতুল্য।

জীবনানন্দ দাস নব্যধারার কবিগণের অগ্রণী। সংকলিত কবিতা দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও বর্তমান যুগের বিকৃত সমাজজীবনের অন্তরাত্মার যথার্থ রূপ এই দুটিতে বিম্বিত হইয়াছে।

পতিত দুর্গত লাঞ্ছিত অনাদৃত মানুষের দরদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জ্বলন্ত বাণীর কিয়দংশ প্রথম অংশে সংকলিত হইল। 'সাত্তিল আরব' বিখ্যাত সুর-শিল্পী বৈতালিক কবির কণ্ঠে উদাত্ত গম্ভীর প্রশস্তিগান। বিষয়বস্তু, ছন্দ, ভাষা ও হৃদয়াবেগের বৈশিষ্ট্যের জন্য গানটি সংকলিত হইল।

কবি বলাইচাঁদ রঙ্গব্যঙ্গ শ্লেষকৌতুক-রসসৃষ্টিতে বর্তমান যুগে অদ্বিতীয়। 'বিদগ্ধ' ঐ শ্রেণীর রচনার চমৎকার প্রতিনিধি।

সজনীকান্ত দাস বর্তমান যুগের একজন অগ্রগণ্য কবি। চোখের ছানি কাটিয়া নব 'বিজ্ঞান' তাঁহাকে যে নব 'দর্শন' দান করিয়াছে

তাহার আলোকে তিনি এই বিশ্বকে নবরূপে দর্শন করিয়াছেন নবায়ন কবিতায়।

'শ্রাবণ-বন্যা' কবিতায় নব্য ধারার শক্তিশালী কবি সুধীন্দ্র দত্ত অবরুদ্ধ পরাণ-পল্বলেও শ্রাবণ বন্যার প্লাবন অনুভব করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনের কবি প্রমথনাথ বিশী এক দিকে যেমন শান্তি-নিকেতনের পার্শ্বচারিণী বাল্যসঙ্গিনী কোপাই-এর ডাক শুনিয়াছেন, তেমনি জীবনীশক্তির আতিশয্যের তাড়নায় দূর-দূর-বহুদূরে বিশ্বের শেষ প্রান্তের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁহার কল্পনাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই রোমান্টিক কবির Yearning for something afar from the sphere of our sorrow.

পল্লী জগতের কবি জসিমউদ্দিন 'রূপাই' কবিতায় সুস্থ সবল পল্লী যুবকের একটি আদর্শ রূপকল্পনার চিত্র দিয়াছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমান যুগের একজন অগ্রগণ্য কবি। ইনি প্রধানতঃ হৃদয়াবেগের কবি। কিন্তু ইঁহার আবেগে সুলভ হৃদয়োচ্ছ্বাস নাই, পাঠকের হৃদয়কে তদ্দারা বিগলিত করাই লক্ষ্য নয়, তাঁহার উচ্চতর লক্ষ্য হৃদয়কে উদাসী করিয়া করুণ রসকে ঔদাস্যঘন শান্ত রসের দিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া। সংকলিত কবিতা দুইটিতে তাহার আভাস মিলিবে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি অপূর্বকৃষ্ণ একটি শান্ত শুচি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সর্বদ্বন্দ্বের সন্ধি ও শান্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনের কবি প্রভাতমোহনের 'মঞ্জীর' কবিতার মর্মকথা "ধরার ধূলার যত কাছাকাছি থাকি"—ততই আমার গৌরব। মঞ্জীর একটা Symbol.

দেশনেতা কবি বিজয়লাল দেশাত্মবোধমূলক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত। নবজাগরিত আফ্রিকার মানবতার পূর্ণ অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের দুর্নিবার প্রয়াসকে কবি অভিনন্দিত করিয়াছেন উদাত্ত কণ্ঠে।

'কুটীরে'র কবি ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতাটিতে কুটীর-বাসিনী বিরহিণীর গোপন হৃদয়বার্তাকে সরস বাণীরূপ দিয়াছেন বর্ষা-প্রভাতের পটভূমিকায়।

'সনেটে'র কবি হুমায়ুন কবির অতীত গৌরবের স্বপ্নমোহ ত্যাগ করিয়া জাতিকে পৌরুষবলে নবগৌরব সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

'চরৈবেতি' কবিতায় কবি অজিত দত্ত সমস্ত অবাস্তর ও অবাস্তব ভার হইতে মুক্ত হইয়া জঞ্জালবর্জিত পথে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে আগাইয়া যাইবার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বর্তমান যুগের মনস্বিনী ও যশস্বিনী মহিলা কবি রাধারাণী দেবী 'কেতকী' কবিতায় শব্দবিজয়ী গন্ধের জয়গান গাহিয়াছেন। কবিতাটির রূপকার্থ ও ছন্দে চরণবিন্যাসের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

সব্যসাচী কবি বুদ্ধদেব বসু প্রাক্তন ধারা ও নব্যধারা দুই ধারায়ই প্রখ্যাত কবি। সংকলিত কবিতাটি প্রাক্তন ধারার। কবি কোন প্রত্যাশা না করিয়া কেন আজিও কবিতা লিখিয়া চলেন তাহারই কৈফিয়ত এ কবিতা। শেষাংশে উত্তর আছে।

নব্যধারার কবি অধ্যাপক বিষ্ণু দে-র সনেটটি গাঢ়বন্ধ ও রসঘন।

অধ্যাপক কবি সুধীর গুপ্তর 'নদী' বলিতেছে 'যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি', তাই সে চিরজঙ্গমা, তাই সে ভূমার অভিমুখিনী।

'অহল্যা'র কবি দিনেশ দাসের 'পদ্মা নদীর চর' কবিতায় গৃহহারাদের বেদনা পরিমূর্ত হইয়াছে।

অধ্যাপক কবি হরপ্রসাদ মিত্রের রসঘন সনেটটিতে বিরহের রূপ যেন—'বালুচর জ্বলে ধূ ধূ সুদীর্ঘ সময়'।

কবি গোপাল ভৌমিক 'লোকটা' নামক রসঘন সনেটটিতে বলিয়াছেন—এই বৈশ্য যুগে এমন মানুষও আছে যে হৃদয়কে প্রাধান্য দিয়া কবির চিত্তে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

প্রভূত সম্ভাবনা লইয়া অকালে প্রয়াত সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'কাশ্মীর' একটি চমৎকার প্রকৃতি-চিত্র।

নানা কারণে অনেক কবিতার কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হইয়াছে—তাহাতে কবিতার ভাবধারা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়—সে দিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কবিতার অধিকারীদের উদ্দেশে এজন্য ক্ষমাভিক্ষা করি।

* * * *

পাঠ্যপুস্তকসংকলনে রবীন্দ্রনাথের দুইটি পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রচনা গ্রহণ করিলে বিশ্বভারতী কোন আপত্তি করেন না। আমি এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সুদীর্ঘ কবিতা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া বিশ্বভারতীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। বিশ্বভারতী অনুগ্রহ পূর্বক ২৪।১।৬১ তারিখের অঃ পূঃ ৯৮৭৩ সংখ্যক পত্রে সে অনুমতি দিয়াছেন। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

জীবিত কবিদের সকলেই আমার ভ্রাতৃস্থানীয়; তবু তাঁহাদেরও ধন্যবাদ জানাই—অনুজগণের জন্য অগ্রজের আশীর্বাদতো আছেই।

কোন কোন মৃত কবির রচনার স্বত্বাধিকারীদের ঠিকানা জানিতে পারি নাই। যাহাই হউক, আমার এই সংকলনটি Mainly composed of non-Copyright matter and bonafide intended for the use of educational institutions—আমি কোন কবির দুইটির বেশি ছোট কবিতা বা কবিতাংশ গ্রহণ করি নাই। [Vide 52 (g), Certain Acts not to be infringement of Copyright] ইতি—

সঙ্কলয়িতা

বিষয়-সূচী

পঞ্চদশ শতাব্দী

	কবিতা	কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	বংশীনাদে—(১)	বড়ু চণ্ডীদাস		১
২।	” (২)	”	...	২
৩।	গৌড়েশ্বরের সভায় কৃত্তিবাস	কৃত্তিবাস	...	৩
৪।	মৃত্যুশয্যায় রাবণ	”	...	৫
৫।	শ্যামসুন্দর	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	৭
৬।	দূতী সম্বোধনে	”	...	৭
৭।	কৃষ্ণের বাঁশী	”	...	৮
৮।	প্রেমের তুলনা	”	...	৮
৯।	মাথুর বিলাপ	”	...	৯
১০।	বসন্তোদয়	বিদ্যাপতি	...	১০
১১।	বিরহে তন্ময়তা	”		১০
১২।	ভাবোল্লাস	”	...	১১
১৩।	প্রতীক্ষমাণা	”	...	১২
১৪।	আশ্বস্তা	”	...	১২
১৫।	অনুতাপ	”		১৩
১৬।	শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি	মালাধর বসু	...	১৪
১৭।	চণ্ডীর চরণে মনসা	বিজয়গুপ্ত	...	১৫
১৮।	শঙ্কর গারুড়ী ও মনসা	”	...	১৬

ষোড়শ শতাব্দী

১৯।	কলহান্তরিতা	রামানন্দ রায়	...	১৭
২০।	মথুরার দূতী	মুরারি গুপ্ত	...	১৭
২১।	শচীর বিলাপ	বাসু ঘোষ	...	১৮
২২।	বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ	”		১৮
২৩।	অবতার রহস্য	নরহরি দাস (সরকার)	...	১৯
২৪।	শ্রীকৃষ্ণের রূপ	গোবিন্দ আচার্য	...	২০
২৫।	নবদ্বীপ	বৃন্দাবন দাস	...	২১
২৬।	নিত্যানন্দ	”	...	২৩
২৭।	গৌরাঙ্গ বারমাসী	লোচনদাস	...	২৪

কবিতা	কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
২৮। জননীর প্রতি শ্রীরাধা	জ্ঞানদাস	...	২৭
২৯। অভাগিনীর আক্ষেপ	”	...	২৮
৩০। বর্ষা বিরহ	”	...	২৮
৩১। বিদ্যাপতি-বন্দনা	গোবিন্দদাস কবিরাজ		৩০
৩২। শ্রীগৌরচন্দ্র	”	...	৩০
৩৩। দুশ্চর সাধনা	”	...	৩১
৩৪। রাধার অসামান্যতা	”	...	৩১
৩৫। আক্ষেপ	”	...	৩২
৩৬। পঞ্চভূতে বিলয়	”	...	৩৩
৩৭। বর্ষাভিসার	রায়শেখর	...	৩৩
৩৮। বর্ষাবিরহ	”	...	৩৪
৩৯। অন্তিম বাসনা	”	...	৩৫
৪০। আকিঞ্চন	নরোত্তমদাস	...	৩৬
৪১। সাধ্যসাধন তত্ত্ব	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	...	৩৭
৪২। কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ	”	...	৩৮
৪৩। গোষ্ঠযাত্রা	বলরাম দাস	...	৩৯
৪৪। আত্মসমর্পণ	”	...	৩৯
৪৫। শ্রীকৃষ্ণের বারমাসিয়া	”	...	৪০
৪৬। দুর্জয় মান	চম্পতি	...	৪২
৪৭। গৌরীর রূপ	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম		৪৩
৪৮। কালকেতুর মৃগয়া	”	...	৪৪
৪৯। খুল্লনার বারমাসী	”	...	৪৫

সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দী

কবিতা	কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
৫০। শিবের সমুদ্রমন্থনে যাত্রা	কাশীরাম দাস	...	৪৭
৫১। বিপ্রবেশে অর্জুন	”	...	৪৮
৫২। বংশীধ্বনি শ্রবণে	যদুনন্দন দাস	...	৪৯
৫৩। শ্রীগৌরাঙ্গ	জগদানন্দ	...	৫০
৫৪। ভাবসম্মিলন	রাধামোহন	...	৫০
৫৫। বর্ষা	দুঃখী শ্যামদাস	...	৫১
৫৬। অন্তিম কামনা	শশিশেখর	...	৫২
৫৭। দেবসভায় বেহুলা	ক্ষমানন্দ কেতকাদাস	...	৫৩

	কবিতা	কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
৫৮।	বাণী বন্দনা	ঘনরাম চক্রবর্তী	...	৫৪
৫৯।	সত্যের মহিমা	”	...	৫৬
৬০।	উমা ও মেনকা	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	...	৫৭
৬১।	লীলার বিলাপ (পূর্ববঙ্গ গীতিকা হইতে)		...	৫৮
৬২।	রতিবিলাপ	ভারতচন্দ্র	...	৬১
৬৩।	হরিহোড়ের বৃত্তান্ত	”	...	৬৩
৬৪-৬৭।	প্রসাদী—(১)-(২)—রামপ্রসাদ সেন		...	৬৫
	” —(৩)-(৪)—রামপ্রসাদ সেন		...	৬৫

প্রাচীন যুগ ও নব্য যুগের সন্ধিকাল

৬৮।	শুকসারী সংবাদ	গোবিন্দ অধিকারী	...	৬৭
৬৯।	প্রতীক্ষা	মদন বাউল	...	৬৮
৭০।	পথের বাধা	”	...	৬৮
৭১।	নন্দ ও যশোদা	দাশরথি রায়	...	৬৯
৭২।	অন্তদৃষ্টি	কমলাকান্ত	...	৭০

আধুনিক যুগ

৭৩।	ব্রহ্মময়ী কন্যা	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)		৭০
৭৪।	ভারতের ভাগ্যবিপ্লব	”	...	৭১
৭৫।	মিত্রাক্ষর	মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)		৭২
৭৬।	বাল্মীকি	”	...	৭২
৭৭।	সমাপ্তে	”	...	৭৩
৭৮।	সমুদ্রের প্রতি	”	...	৭৩
৭৯।	রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা	”	...	৭৪
৮০।	দশরথের প্রতি কেকয়ী	”	...	৭৬
৮১।	মেঘনাদ ও বিভীষণ	”	...	৭৮
৮২।	দিবাবসানে—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭)			৮১
৮৩।	সূর্য—দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)		...	৮২
৮৪।	বিশ্বরূপ—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (১৮৩২-১৯০১)		...	৮৪
৮৫।	আদিকবি—বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)		...	৮৫
৮৬।	সারদা ” ” ...		...	৮৭
৮৭।	জননী—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭-১৮৭৮)		...	৮৮

	কবিতা কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
৮৮।	সখীর প্রতি শচী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)		৮৯
৮৯।	জীবন মরীচিকা " "	...	৯২
৯০।	যমুনা লহরী—গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৯-১৯১৭)	...	৯৩
৯১।	অলকা পুরী—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)	...	৯৪
৯২।	ব্যাকুলতা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১)	...	৯৬
৯৩।	রাণীর মত—নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)	...	৯৭
৯৪।	কৃষ্ণার্জুন " "		১০০
৯৫।	বৈশাখ—দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)	...	১০২
৯৬।	চিরযৌবনা " " ...	...	১০৩
৯৭।	ঊষার শিশির—গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)	...	১০৪
৯৮।	বঙ্কিমচন্দ্রের চিরবিদায়ে " "		১০৪
৯৯।	চির আকাংক্ষিত—গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী (১৮৫৮-১৯২৪)		১০৬
১০০।	শৃঙ্খলমুক্ত—অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)	...	১০৭
১০১।	জিজ্ঞাসা " "	...	১০৮
১০২।	ফাঁকি—রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)	...	১০৯
১০৩।	তপোভঙ্গ " "	...	১১৪
১০৪।	স্বর্গ হইতে বিদায় "	...	১১৮
১০৫।	ভাষা ও ছন্দ "	...	১২২
১০৬।	পৃথিবী " "		১২৬
১০৭।	প্রথম পরিচয়—বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)		১২৯
১০৮।	পান্থ " "	...	১৩০
১০৯।	হাসি ও অশ্রু—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)	...	১৩১
১১০।	সুখ মৃত্যু " "	...	১৩২
১১১।	গঙ্গা " "	...	১৩৩
১১২।	ধরায় দেবতা চাহি—কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)	...	১৩৩
১১৩।	এরা যদি জানে " "	...	১৩৪
১১৪।	কান্তগীতি (১)—রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)	...	১৩৫
১১৫।	কান্তগীতি (২) " "	...	১৩৬
১১৬।	কান্তগীতি (৩) " "	...	১৩৬
১১৭।	বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ—মানকুমারী বসু (১৮৬৪-১৯৪৩)		১৩৭
১১৮।	তাজমহল—প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)	...	১৩৯
১১৯।	চৌরিপুষ্প " "	...	১৩৯

কবিতা কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
১২০। অন্তিমে—চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫)	...	১৪০
১২১। মেঘের দল—অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)	...	১৪১
১২২। মাতৃহৃদয়—প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)	...	১৪২
১২৩। ব্যর্থ চেষ্টা " "	...	১৪২
১২৪। জীবন-মাধুরী—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯)		১৪৩
১২৫। আমি—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০)	...	১৪৩
১২৬। জ্ঞান ও ভক্তি " "	...	১৪৪
১২৭। খ্যাতি—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি (১৮৭৩-১৯২৭)	...	১৪৪
১২৮। মৃত্যু—রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৭-১৯২৭)	...	১৪৫
১২৯। শ্রীক্ষেত্র—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)	...	১৪৭
১৩০। রেবা " "	...	১৪৯
১৩১। স্বপ্নদেশে—যতীন্দ্রমোহন বাগচি (১৮৭৮-১৯৪৮)	...	১৫০
১৩২। মাধবিকা " "	...	১৫১
১৩৩। গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড—কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩—)	...	১৫২
১৩৪। মহাকাল " "	...	১৫৪
১৩৫। ভাঙ্গা বেহালা "	...	১৫৬
১৩৬। কবর-ই-নূরজাহান (অর্ধাংশ)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)		১৫৭
১৩৭। বৈকালী (অর্ধাংশ) "	...	১৬০
১৩৮। ব্যথার স্মৃতি—কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১)		১৬২
১৩৯। লোহার ব্যথা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)		১৬৩
১৪০। ভিখারী দেব " "	...	১৬৪
১৪১। জেবউন্নিসা—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ (১৮৮৭-১৯৬০)	...	১৬৫
১৪২। কালাপাহাড়—মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)		১৬৬
১৪৩। বসন্ত আগমনী " "	...	১৬৮
১৪৪। কয়েদী—হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮—)	...	১৬৯
১৪৫। রসলক্ষ্মী—নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯—)	...	১৭০
১৪৬। খণ্ডকপালী—কালিদাস রায় (১৮৮৯—)	...	১৭১
১৪৭। কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহার	...	১৭২
১৪৮। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা—সুশীলকুমার দে (১৮৯০—)	...	১৭৪
১৪৯। সম্ভোগ—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৮৯০—)	...	১৭৫
১৫০। ঊষা-সূক্ত—অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪—)	...	১৭৫
১৫১। দুটি গান—দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭—)	...	১৭৬

কবিতা কবি		পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫১ক। শ্রীরামকৃষ্ণ—দিলীপকুমার রায়	...	১৭৭
১৫২। পুনর্বাসন—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮—)	...	১৭৭
১৫৩। রবীন্দ্রনাথ—কৃষ্ণদয়াল বসু (১৮৯৮—)	...	১৭৮
১৫৪। বেদে—কৃষ্ণধন দে (১৮৯৮—)	...	১৮০
১৫৫। জয়তু আফ্রিকা—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৯—)	...	১৯৩
১৫৬। দুইটি সত্যবাণী—জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪)		১৮১
১৫৭। জীবন বন্দনা—কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—)	...	১৮২
১৫৮। শাতিল আরব " "	...	১৮৩
১৫৯। বিদগ্ধ—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯—)	...	১৮৪
১৬০। নবায়ন—সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)	...	১৮৫
১৬১। শ্রাবণ বন্যা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১)	...	১৮৫
১৬২। মেরুর ডাক—প্রমথনাথ বিশি (১৯০২—)	...	১৮৬
১৬৩। কোপাই " "	...	১৮৭
১৬৪। মনে পড়ে—সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৬)	...	১৮৭
১৬৫। রুপাই—জসিমউদ্দিন (১৯০৩—)	...	১৮৮
১৬৬। ভাড়াটে কুঠি—প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—)	...	১৮৯
১৬৭। পুরানো কাগজের ফেরিওলা " "	...	১৯০
১৬৮। বিদ্রোহী—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯০৪—)	...	১৯১
১৬৯। মঞ্জীর—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫)	...	১৯২
১৭০। সনেট—হুমায়ুন কবির (১৯০৬—)	...	১৯৫
১৭১। শেষ রাতের বাদল—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬)		১৯৬
১৭২। চরৈবেতি—অজিত দত্ত (১৯০৭)	...	১৯৭
১৭৩। কেতকী—রাধারাণী দেবী (১৯০৭)	...	১৯৮
১৭৪। আর কিছু নাহি সাধ—বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮)	...	১৯৯
১৭৫। নদী—সুধীর গুপ্ত (১৯১৪)	...	২০০
১৭৬। পদ্মানদীর চর—দিনেশ দাশ (১৯১৫)	...	২০১
১৭৭। ইলোরা—বিষ্ণু দে (১৯০৯)	...	২০২
১৭৮। বিরহ—হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭)	...	২০২
১৭৯। লোকটা—গোপাল ভৌমিক (১৯১৮)	...	২০৩
১৮০। কাশ্মীর—সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭)	...	২০৪

মাধুকরী

বংশীনাদে

বড়ু চণ্ডীদাস

(১)

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁঞি উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে জেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ২ ॥

(২)

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে॥ ধ্রু॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ॥
সেইত বাঁশীর নাদ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে থেপিলোঁ।
বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল॥
যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তাঁহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

গৌড়েশ্বরের সভায় কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস

রাজপণ্ডিত হব মনে এই আশা করে।
সপ্তশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারিহস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটী বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র করি আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ-লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥

পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
রাজার ঠাঁই দাণ্ডাইলাম হাত চারি আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতীপ্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানাছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমাপানে চায়॥
নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন প্রবোধ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে হয় কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সপ্তকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

মৃত্যুশয্যায় রাবণ

প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজধর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে শুনিব কিঞ্চিৎ রাজনীত॥
দশানন বলে রাম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীত করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যদি হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
ফেলিয়া রাখিবে যদি হয় মন্দ কাজ।
প্রমাণ তাহার কহি শুন রঘুরাজ॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে॥
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুগণ॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা॥
অন্ধকার চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে॥
তাহা দেখে বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়॥
এত ভাবি সেইদিন এলেম লঙ্কায়॥
পুরাব নরক কুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে॥
হেলায় রহিল পড়ে না হৈল পূরণ।
তারপর তব সঙ্গে বাধিল এ রণ॥

আর এক কথা কহি দেখ বিদ্যমান।
সূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ॥
সেই আসি উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি কালি নহে সীতা আনিব পশ্চাতে॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিব পাছে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্রগতি হরে আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মম সীতার জন্যেতে॥
একলক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা অধিপতি॥
যদি সীতা না আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥
এইমত রাবণ কহিল নীতি কথা।
কহিতে কহিতে হৈল জিহ্বার জড়তা॥
শ্রীচরণে দৃষ্টি করি প্রাণত্যাগ কৈল।
রাবণের মৃত্যু কৃত্তিবাস বিরচিল॥

শ্যামসুন্দর

দ্বিজ চণ্ডীদাস

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল রে
চাঁদ নিঙগাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙগাড়ি কেবা মুখানি বনাইল রে
জবা নিঙগাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়িল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
কানড়-কুসুমে কেবা সুষম করিল রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি ঊরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ॥

দূতী সম্বোধনে

দিবস রজনী গুণ গণি গণি কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে খাইনু আপন মাথা॥
বিষের গাগরী ক্ষীরে মুখ ভরি কে না আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার এ বধ কাহারে লাগে॥

আর এক কথা কহি দেখ বিদ্যমান।
সূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ॥
সেই আসি উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি কালি নহে সীতা আনিব পশ্চাতে॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিব পাছে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্রগতি হরে আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মম সীতার জন্যেতে॥
একলক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা অধিপতি॥
যদি সীতা না আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥
এইমত রাবণ কহিল নীতি কথা।
কহিতে কহিতে হৈল জিহ্বার জড়তা॥
শ্রীচরণে দৃষ্টি করি প্রাণত্যাগ কৈল।
রাবণের মৃত্যু কৃত্তিবাস বিরচিল॥

শ্যামসুন্দর

দ্বিজ চণ্ডীদাস

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল রে
চাঁদ নিঙগাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙগাড়ি কেবা মুখানি বনাইল রে
জবা নিঙগাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়িল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
কানড়-কুসুমে কেবা সুষম করিল রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ॥

দূতী সম্বোধনে

দিবস রজনী গুণে গণি গণি কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে খাইনু আপন মাথা॥
বিষের গাগরী ক্ষীরে মুখ ভরি কে না আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার এ বধ কাহারে লাগে॥

নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে ব্যাধশর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে বঁড়শী লাগিল মুখে॥
জলদ নেহারি পিয়াসে চাতকী চঞ্চু পসারল আশে।
বারিদ বারণ করল পবন কুলিশ মিলিল শেষে॥
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মাখাইয়া অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে নিকটে মরণ ভেল॥
লাখ হেম পায়্যা যতনে বাঁধিতে পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

কৃষ্ণের বাঁশী

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে সে গুমরিয়া মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মসি লাভ॥

প্রেমের তুলনা

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু রহে স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে ধীর॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

মাথুর বিলাপ

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিঁচ না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ লাগে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুল চাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনেতে দিই ঝাঁপ আগুন নিভায়।
পাষাণেতে দিই কোল পাষাণ মিলায়॥
তরুতলে যাই বড়াই সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুই মরোঁ যে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছটফট্ করে প্রাণ বঁধু নাহি ঘরে॥

বসন্তোদয়

বিদ্যাপতি

আএল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড।
কেশর-কুসুম ধএল হেমদণ্ড॥
নৃপ-আসন নব পীঠল-পাত।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসালমুকুল ভেল তায়।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবল্লী তরু ধএল নিশান।
পাটল তূণ অসোকদল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা একসঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমখিকাকুল।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান॥
নববৃন্দাবন রাজ বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

বিরহে তন্ময়তা

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল
আপন গুন লুবুধাঈ॥

মাধব অপরূপ তোহারি সিনেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জর জর
জিবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বানি॥
রাধা সয়েঁ জব পুনতহিঁ মাধব
মাধব সয়েঁ জব রাধা।
দারুন প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহু দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

ভাবোল্লাস *

কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কৈলুঁ যতন।
অব হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাও।
অব হাম দূর দেশে পিয়া না পাঠাও॥
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও।
বরিসার ছত্র পিয়া দরিয়ার নাও॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনকে দুখ দিবস দুই চারি॥

---

* এই পদটি বাংলা ভাষায় রচিত। ইহা বাঙ্গালী বিদ্যাপতির।

প্রতীক্ষমাণা

সজনি কে কহ আওব মধাঈ।
বিরহপয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নহি' পতিআঈ॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গোঙায়লু
ছোড়লু জীবনক আসা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লু
খোয়ালু কানুক আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী জদি জারব
কি করব মাধব মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবজোবন বিরহ গোঙায়ব
কি করব সে পিয়া নেহে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জোবতি
অব নহি হোই নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুঅ পাশ॥

আশ্বস্তা

প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি
পহু তজি গেলাহ বিদেস।
কত হম ধৈরজ বাঁধব সজনি
তনি বিনু সহব কলেস॥
আওন অবধি বিতীত ভেল সজনি
জলধর ছপল দিনেস।
সিসির বসন্ত উসম ভেল সজনি
পাওস লেল পরবেস॥

চহুদিস ঝিংগুরে ঝঙ্কর্ সজনি
পিক সুন্দয় করু গান।
মনসিজ মারু মরম সর সজনি
কতেক সুনব হম কান॥
সেজ কুসুম নহি ভাবয় সজনি
বিস সম চানন চীর।
জইও সমীর সীতল বহু সজনি
মন বচ উড়ল সরীর॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল সজনি
মন ধনি করিঅ হুলাস।
সুদিন হেরি পহু আওত সজনি
মন জনি করিঅ উদাস॥

অনুতাপ

জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলু
মেলি পরিজনে খায়।
মরনক বেরি হেরি কোঈ ন পুছত
করম সঙ্গ চলি জায়॥
এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপপয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলু
জুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভনহু বিদ্যাপতি লেহ মনে গনি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাজে॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

মালাধর বসু

বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশিনাদ পূরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥
বৎসগণ সঙ্গে আইসে বেণু বাজাইয়া।
গোকুলের রমণীর চিত্ত যে হরিয়া॥
যমুনার কূলে যবে বাঁশীতে দেই সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহয়ে উজান॥
দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি।
যাহাত শুনিয়া তপ ছাড়ে সব মুনি॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূরপক্ষ নাচিতে লাগিল॥
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীনাদে ফুল ফল ধরে তরুগণে॥
যত পক্ষীগণ থাকে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংশীর নাদ শুনে এক মনে॥

চণ্ডীর চরণে মনসা

বিজয় গুপ্ত

জনম-দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ম্ম-ফল।
দেবকন্যা হৈয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুনগো জননি।
বিধাতা করিল মোরে জনম-দুঃখিনী॥
আপন দুঃখের কথা কহিনু সকল।
তোমার কিছু দোষ নাই মোর কর্ম্মফল॥
কোলের বালিকা হয়্যে বুঝাই তোমারে।
তোমার উদর ছাড়া কে জন্মিতে পারে॥
জগৎ-ঈশ্বরী তুমি দেবী মহামায়া।
তবে কেন মোর প্রতি হইলা নিদয়া॥
মায়ে ঝিয়ে বিসম্বাদ কেবা নাহি করে।
ক্রোধ সম্বরিয়া মাগো ক্ষমহ আমারে॥
কাকুতি করিয়া পদ্মা গৌরী স্থানে কয়।
ফিরিয়া না চাহে চণ্ডী দারুণ হৃদয়॥
বিশেষ বুঝিলাম মাগো তোমার মনের আশ।
বিদায় লইয়া মাগো যাই বনবাস॥
শিবপুরী থাক তুমি আমি যাই বন।
তোমার নাহিক দোষ কপালের লিখন॥
জানিনু বড়ই তোমার নিষ্ঠুর শরীর।
প্রণাম করিয়া পদ্মা চলে ধীরে ধীর॥
শিব ঠাঁঞি শুনি তুমি দয়াল প্রচুর।
এবে সে বুঝিলাম তব দয়া কত দূর॥
শুনি মাতা ভগবতী পর্ব্বত-দুহিতা।
পাষাণ তোমার কায়া জানিনু সর্ব্বথা॥
এমন অশক্য কথা কোন জনে বলে।
আপন কন্যাকে নিজ ফেলে ভূমিতলে॥

মনসা-মঙ্গল—বিজয়গুপ্ত, খৃঃ ১৫শ শতাব্দী।

শঙ্কর গারুড়ী ও মনসা

সাজিয়া গোয়ালিনী বেশ চলিল শঙ্কুর দেশ
কপটে বধিতে ধন্বন্তরি।
ছন্দে বন্ধে বান্ধে খোপা পৃষ্ঠেতে পাটের থোপা
শ্রবণে সোনার মদন-কড়ি॥
সুবর্ণ অলঙ্কার গায় চলন্ত নূপুর পায়
উল্লাসে পরিল পাটের সাড়ী॥
চন্দন লেপিয়া অঙ্গ কপালে তিলক রঙ্গ
মুখে পান করে খল খলে।
মাণিক্য দোসর জ্যোতি গলায় শোভিছে পাতি
দু'নয়ন ভরিল কাজলে॥
পদ্মাবতী কুতূহলে খঞ্জন-গমনে চলে
যথা ওঝা ধন্বন্তরি থাকে।
দাঁড়াইয়া ওঝার পাশে আড় নয়নে হাসে
দধি লবা ঘন ঘন ডাকে॥

পদ্মা কিসেরে সাজাইলা বিষ-দধি।
আমারে মারিতে হেন তোমার মনে লয় কেন
কেবা তোরে দিল হেন বুদ্ধি॥
গোটা কত নাগ পোষ তে কারণে লোকে ঘোষ
বিবাদে আগল বিষহরী।
হেন বুদ্ধি কেবা করে জানে সবে চরাচরে
আমি বিষ খাইলে না মরি॥
কি কহিব আপন কথা মহাজ্ঞান দিল নেতা
তে কারণে অজর অমর।
সাপ খাম বিষ পেম চারি যুগে মুঞি জীম
পদ্মা মোর যমে নাই ডর॥
মুঞি ধোপাঝির শিষ ঝারি ভরি পেম বিষ
তক্ষক চিবাইতে পারি দন্তে।
ধন্বন্তরি কথা কয় পদ্মার মনেতে লয়
বিজয় গুপ্ত রচিল সানন্দে॥

কলহান্তরিতা

রামানন্দ রায়

শ্রীকৃষ্ণের দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি॥
না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন।
দুহুক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

মথুরার দূতী

মুরারি গুপ্ত

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অ-যোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইলা বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু রাতি॥

✓শচীর বিলাপ

বাসু ঘোষ

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়নমন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজ্র পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে কাঁদে উচ্চৈস্বরে শোকে
যারে তারে পুছয়ে বারতা।
একজন পথে ধায় দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চননগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌর হরি
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ

বাসু ঘোষ

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে পাথারে ভাসাঞা গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।

বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পুরুবে নন্দের বালা যবে মধুপুর গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদমুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখবিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

অবতার-রহস্য

নরহরি দাস

ব্রজভূমি করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর বর্ণ করি ভাবান্তর
পুন বাড়াও বিরহ জঞ্জাল॥
নাহি শিখিপুচ্ছ চূড়া নাই সেই পীতধড়া
করে নাই মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান বাঁধিলে গোপীর প্রাণ
সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন এবে হেরি সুলোচন
নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন এরূপে ভুলে না মন
তুমি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস
সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের সেই কথা বলিতে মরমে ব্যথা
যে হইল উভয় মিলনে॥

শচীর বিলাপ

বাসু ঘোষ

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়নমন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে কাঁদে উচ্চৈস্বরে শোকে
যারে তারে পুছয়ে বারতা।
একজন পথে ধায় দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চননগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌর হরি
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ

বাসু ঘোষ

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে পাথারে ভাসাঞা গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।

আখুকরী

বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূর্বে নন্দের বালা যবে মধুপুর গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদমুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখবিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

অবতার-রহস্য

নরহরি দাস

ব্রজভূমি করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর বর্ণ করি ভাবান্তর
পুন বাড়াও বিরহ জঞ্জাল॥
নাহি শিখিপুচ্ছ চূড়া নাই সেই পীতধড়া
করে নাই মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান বধিলে গোপীর প্রাণ
সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন এবে হেরি সুলোচন
নাই সে ভঙ্গিমচ বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন এরূপে ভুলে না মন
তুমি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস
সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের সেই কথা বলিতে মরমে ব্যথা
যে হইল উভয় মিলনে॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

গোবিন্দ আচার্য

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈসত হাসির তরঙ্গহিলোলে
মদন মুরছা পায়॥

সে শ্যাম নাগরে কি খেনে দেখিলু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥

মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিয়া হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়।

নবদ্বীপ

বৃন্দাবন দাস

(গৌরচন্দ্রের উদয়ের আগে)

নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহি' অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য-আচার॥
'ধর্ম্ম'-কর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচন্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে।
এই সবে রত আর কিছু না জানয়ে॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্দী মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বই গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী অভিমানী।
তা' সভার মুখে-ও নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতী যে স্নানের সময়ে।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়ে॥
গীতা-ভাগবতে যে যে জনে বা পঢ়ায়ে।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়ে॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমতে এসব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ পূজা গঙ্গা স্নান কৃষ্ণের কথন॥
সভে মেলি জগতের করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

নিত্যানন্দ

বৃন্দাবন দাস

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ　　কেবল আনন্দ কন্দ
　　ঝলমল আভরণ সাজে।
দুই দিগে শ্রুতিমূলে　　মকরকুণ্ডল দোলে
　　গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে॥

সুবলিত ভুজদণ্ড　　জিনি করিবর শুণ্ড
　　তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ অম্বর গায়　　সিংহের গমনে ধায়
　　দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥

অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ　　দুটি আঁখি রক্তবর্ণ
　　তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বাহিয়া যেন　　গঙ্গা ধারা বহে হেন
　　দেখি সুরলোকের আনন্দ॥

সর্ব্বাঙ্গে পুলক ছটা　　যেন কদম্বের ঘটা
　　লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীরদাপ মালশাটে　　শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
　　দেখি ব্রহ্মলোক করে স্তুতি॥

চৈতন্যের প্রেমরত্ন　　জীবেরে করিয়া যত্ন
　　দিল পহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে　　আপনার কর্ম্মদোষে
　　না ভজিলুঁ নিতাই পদদ্বন্দ্বে॥ ১০॥

গৌরাঙ্গ বারমাসী

লোচন দাস

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা-দিবসে
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ-গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে তোমার জন্মতিথি শুভা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা॥

চৈত্রে চাতক পংখী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে।
তুমি দূরদেশে গোঁয়াইব কার কোলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥

বৈশাখে চম্পক লতা নৌতুন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা॥
কুঙ্কুমচন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন্ সাধে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র॥

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপে তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশি দিন।
ছট ফট করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে নিদারুণ-হিয়া।
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥

শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার ঘাট॥
ও গৌরাঙ্গ পহু মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পহু হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতি কিছু কর অবধান॥

ভাদ্রে ভাস্কর-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা সুদূরে পলায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহু হে বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা॥

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত-সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহু হে মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহু হে অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥

অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাট নেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি সহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে॥

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে মোরে লেহ নিজ-পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥

জননীর প্রতি শ্রীরাধা

জ্ঞানদাস

মাগো গেন্দু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী
লয়ে গেল মোরে ঘরে॥
গোপরাজরাণী নন্দের গৃহিণী
যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়াইল মোর প্রাণ॥
কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে
লয়ে বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে॥
বিজুরি উজোর মোর অংগখানি
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঁই
কি হেতু মাগল বর॥
তবে মোর গোরা গা-খানি মাজিয়া
লাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে পাঠাইলা দেখ
এ সব আঁচরে দিয়া॥
ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস হিয়ায় বরিষে
কহে কবি জ্ঞানদাসে॥২৩॥

✓অভাগিনীর আক্ষেপ

জ্ঞানদাস

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলু
রবির কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলু অগাধ জলে।
লছিমি চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারালু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

বর্ষা-বিরহ

জ্ঞানদাস

গগনে ভরল নব বারিদ হে
বরখা নব নব ভেল।
ঝর ঝর বাদর ডাকে ডাহুকী সব
শবদে পরাণ হরি নেল॥

চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই
মদনবিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহ বড়
বরখা কেমনে গোঁয়াব॥

সরসিজ বিণু সর শোভা না পাবই
কমল না শোভে অলিহীনা।
হাম কমলিনী কান্ত দেশান্তর
কত না সহব দুখ দীনা॥

সঞ্চরু সঘন সৌদামিনী জনু
বিন্ধয়ে শর খরধার।
মাস শাঙনে আশ নাহি জীবনে
বরিখয়ে জল অনিবার॥

নিশি আন্ধিয়ার অপার ঘোরতর
ডাহুকি ডহ ডহ ভাখ।
বিরহিণী-হৃদয়- বিদারণ ঘন ঘন
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥

উনমতি শকতি আরোপয়ে কাম নিতি
জনু শব-সাধন লাগি।
ভাদর দর দর অন্তর দোলন
মন্দিরে একলি অভাগী॥

উলসিত কুন্দ কুমুদ পরকাশিত
নিরমল শশধরকাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে সব রঙ্গিণী
নাহি জানে ইহ দিন রাতি॥

চির-পরবাসি যতহুঁ পরদেশী
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন খীন ভেল কলেবর
জ্ঞান কহে দুখ কোন দেল॥

বিদ্যাপতি বন্দনা

গোবিন্দদাস কবিরাজ

বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিকশিরোমণি নাগর-নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥
জনু বামন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ খোঁজব
মিলব কল্পতরু-নিকরে॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধ হিঁ
ভকত নখর মণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব
তৈখন উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল
ভকত কৃপা বলবান॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

নীরদ-নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাবকদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর॥

চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর॥
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর॥

দুষ্কর সাধনা

কন্টক গাড়ি' কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরী-বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূরতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধিরসম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ॥

রাধার অসামান্যতা

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যবধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়নি কহত কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরিসম লাগি।

রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি-রস-মরিয়াদ॥

আক্ষেপ

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন-গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥
সজনি এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু-অনুরাগ-ভুজঙ্গে গরাসল
কুল দাদুরি মতি মন্দ॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহ-পতি শপতিক ঠান॥
নয়নক নীর থীর নাহি বান্ধই
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥

পঞ্চভূতে বিলয়

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ-সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

বর্ষাভিসার

রায়শেখর

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥

সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
আথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জিবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর- বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

বর্ষাবিরহ

সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া॥
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কতশত পাত মোদিত
মোর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভনয় শেখর কৈছে নিরবহ
হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

অন্তিমবাসনা

কহিয় কানুরে সই কহিয় কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিলু মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সভার সনে পুনরায় হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে আর নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দূতি চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন না স্ফুর॥

আকিঞ্চন

নরোত্তম দাস

ওহে নাগরবর শুনহে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর মণি জনু চান্দের গাঁথুনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥

শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে যখন তুমি যাওহে রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাড়াঞা।
মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রইল তুয়া পথ চাঞা॥

যখন তোমায় পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন-পানে
আল্যাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বন্ধুর গুণ গাই
ধুমার ছলায় বসি কান্দি॥

মণি নও মাণিক্য নও হিয়ার মাঝারে ধরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

অগোর চন্দন হৈতাম শ্যামাঙ্গ লেপিয়া রৈতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামনের চান্দে হাত
বিহি কিয়ে পুরাবে আমায়॥

নরোত্তম দাসে কয় তোমার বিচিত্র নয়
তুমি মোর না ছাড়িও দয়া।
যেদিন তোমার ভাবে আমার এ প্রাণ যাবে
সেই দিন দিহ পদ ছায়া॥

সাধ্যসাধন তত্ত্ব

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জন কথা কন বসি রহঃ স্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তপ্রেম সর্বসাধ্যসার॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥
পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে
শুভ্র বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহির্বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
সেই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ (ঐ)

গোষ্ঠযাত্রা

বলরাম দাস

নটবর নব কিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে ধূলিধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ বোলত ঘন মধুর মুরলী বায় গো॥
নীল কমল বদন চান্দ ভাঙুর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুলচন্দ পবন বহয়ে মন্দ মন্দ
মধুকর মন হয়ে বিভোর নিরখি নিরখি ধায়গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো।
বলরাম দাস করত আশ রাখাল সঙ্গে সতত বাস
বেত্র মুরলী লইয়ে খুরলি সঙ্গে সঙ্গে যায় গো॥

আত্মসমর্পণ

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্পকাল যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিয়া তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
দরপণ নীরস সুদূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া সখি ছানিয়া বিজলী।
অমিয়ার সাঁচে যদি রচিয়ে পুতলি॥
রসের সায়র মাঝে করাই সিনান।
তভু তো না হয় তোমার নিছনি সমান॥

হিয়ার ভিতরে থুইতে নহ পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নয় থির॥

শ্রীকৃষ্ণের বারমাসিয়া

আঘণমাস নাহ-হিয় দাহই শুনইতে হিম-ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির সুন্দরি তুহুঁ ভেলি বাম॥
কিয়ে নিশি বাসর গরগর অন্তর জরজর মরমক ঠাম।
বিদগধ-রায় মুগধ চিত অবিরত সোঙরিয়া তুয়া গুণ গাম।
সুন্দরী কো কহ ও দুখ ওর।
বিষম কুসুম-শর-জরে ভেল দুবর বল্লবরাজকিশোর॥

পৌষ-তুষার তুষানলে ডারল জীবন নায়রি নাহ।
সুধিরসমীর সুধাকরশীকর পরশ গরলঅবগাহ॥
অহর্নিশি ডহডহ পিয়া জিউ থির নহ দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ॥

মাঘহি দিননিশি শিশিরক শীকর নিকরহুঁ অবনি আগোর।
উলটি পালটি অনুখন ছটফটি তনু দহে সহচরি-কোর॥
তুয়া গুণে কামিনি কত হিম যামিনি জাগরে নাগর ভোর।
সরসিজ-মোচন বর-লোচনে রহুঁ ঝরতহি ঝর ঝর লোর॥

ফাগুনে মধুপুর নাগরি নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গ।
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গ॥
তুহুঁ সে নিরন্তর লাগনি অন্তর কি করব রঙ্গিনি সঙ্গে।
শীতল ভূতলে লুঠয়ে বেয়াকুল দংশল বিরহ-ভুজঙ্গে॥

দুরহি বিরহিগণ তেজই জীবন শুনি অছু নাম দুরন্ত।
সো মধু-মাস বিলাসত জনে জনে আওল কাল বসন্ত॥
বিকসিত কুসুম ভরল সব কানন চৌদিশে ভ্রমর ঝঙ্কার।
তরু পর কোকিল পঞ্চম গায়ই নিশি দিশি জীবন জার॥

পাপনিশাকরকিরণ পসারল জগভরি আনল বিথার।
মাধবি মাসে আশে জিউ না রহ অব কি সহব দুখ ভার॥
শীতল শতদল-শয়নে শুতায়ল কিশলয় ভরি পরিযঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণি লুঠিলোরে করই মহি পঙ্ক॥

কত ঘন চন্দন কত কত বীজন সজল জলজ বিথ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল কিয়ে দুরবিহি ভেল বঙ্কা॥

নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর বরিখা নব পরবেশে।
অনুখন মধুরজলদধনি শুনিশুনি গুণিগুণি উঠয় তরাসে॥
সব নব পল্লব লাগল মনোভব বিহি করু সব অব শেষ।
কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে গাড়ল বাড়ল গাঢ় কলেশ॥

গগনহি সঘন ঘনহি ঘন গরজন দামিনি দশ দিশ-পাত।
যামিনি ঘোর তিমির ভর হেরইতে থরহরি কাঁপয়ে গাত॥
এ দুখ-সায়র নিমগন নায়র তহি হত-দাদুরি রাব।
শাঙন গহন দহন দহ জীবন কিয়ে জানি হরি-বধ পাব॥

উদ ভাদর দিন নিরখিতে তনু খিন দারুণ দুরদিনমান।
বিরহহিলোলহি দর দর অন্তর দোলত চপল পরাণ॥
তুয়া বিনু দিগুণ শূন সব মন্দির মনমথ-তৃণসমান।
একল বিকল সকল নিশি বিলপই অবিরত ঝরয়ে নয়ান॥

উজোর হিমকর নভ-তল নিরমল চাঁদনি রয়নি উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই বিকশিত পদুমিনি-কোর॥
তুয়া দরশন বিনু অতিখিন জীবন গদগদ কয় আধবোল।
আশিন সারস হংস-শবদ শুনি পিয়া জিউ অতি উতরোল॥

বিহরই বিহগ সুভগতটিনী-তট সরসিজ ভেল পরকাশ।
জগ-জন-লোচন তনু-মন-মোহন আওল কাতিক মাস॥
অবহুঁ অনঙ্গ-ভুজঙ্গ গরাসল অব নাহি জিবনক আশ।
নিশি দিশি অনুখন গুণি গুণি তুয়াগুণ উনমত বারহি মাস॥
অব ভেল অচেতন মুদি রহু লোচন ঘন ঘন তেজই শ্বাস।
তুহুঁ মণি মন্তর তুয়া নাম প্রতিকার নিবেদল বলরাম দাস॥

দুর্জ্জয় মান

চম্পতি

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর আহিরিণি জাতি॥
সকল জীবজন জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥
থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥
খেনে খেনে সকল কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনি সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দিগুণ সখিমাঝে।
চম্পতি পতি অতি আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥

গৌরীর রূপ

কবিকঙ্কণ

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ আন দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইলা মেনকা॥
উরুযুগ করিকর নাভি সে গভীর সর
দুই ভুজ মৃণাল-সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার-শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
গৌরীর দশন-রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব-বিচি
মলিন হইলা লজ্জাভরে।
হেন বুঝি অনুমানে ঐ শোক ভাবি মনে
পক্ককালে দালিম্ব বিদরে॥
অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ—গঞ্জন বিলোচন।
অতসী-কুসুম তনু ভ্রূযুগ কামের ধনু
সুগন্ধি চন্দনবিলেপন॥
নাসার উপরে মোতি হীরায় জড়িত শ্রুতি
বদন-কমলে ভাল সাজে।
তবে তুলা দিতে পারি যদি অতি মনোহারী
শোভে তারা সুধাকর মাঝে॥
গৌরীর বদন শোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চান্দ নাহি দেয় দেখা।
মলিন চান্দ ঐ শোকে, না বিচারি সর্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
শ্রবণ-উপরদেশে, হেমমুকুলিকা ভাসে
কিঞ্চিত কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিজুরি সাজে
পরিহরি চপলতা-দোষে॥
মুকুতার হার গলে সিন্দুর চন্দন ভালে
ভুজে শঙ্খ কঙ্কণ কেয়ুর।

অসিত চামর কেশে　　　কুণ্ডল শ্রবণ-দেশে
পদযুগে সুনাদ-নূপুর॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ　　　ভাবেন পর্বত-ভূপ
কারে করি এই কন্যা দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ　　　করিয়া পাঁচালি বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (চণ্ডীমঙ্গল)

কালকেতুর মৃগয়া

কবিকঙ্কণ

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।
কুরুরাজ-সেনা যেন বধে বৃহন্নল॥
শুণ্ডে ধরি আছাড়িয়া মারে মাতঙ্গেরে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে॥
চুবড়ি মূলায়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা।
কৃষাণে যেমন বেচে মূলার পসরা॥
ফুল্লরা পসার করে নগর-চাতরে।
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে॥
ভল্লুক স্নান্ধায় গর্তে ভয়ে কম্পমান্।
তাড়ায়্যা মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ॥
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।
পণদরে বেচে শিঙ্গা নেয় শিঙ্গাদারে॥
যন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে আনে বাঘছাল।
তার নখ খুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়াল॥
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
যতনে কিনিয়া লয় কাপালী সন্ন্যাসী॥
শরভে শরভে মারে ঢুসাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডার বান্ধিয়া কাণ্ডে খড়্গ তার ছিণ্ডে॥
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ।
ব্রাহ্মণ সজ্জন নেয় করিতে তর্পণ॥

বন বেড়ি এড়ে জাল ঝোপে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ছোট পশু পায়্যা তাড়াতাড়ি॥
শশারু হরিণ মারি লতাপাশে বান্ধে।
ঘর আইসে মহাবীর ভার লৈয়া কান্ধে॥
ফুল্লরা বীরের তরে কর্য়াছে রন্ধন।
চণ্ডিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (ঐ)

খুল্লনার বারমাসী

খুল্লনায় বলে প্রভু যদি দেও মন।
বার মাসের যত দুঃখ করি নিবেদন॥
বার মাসের যত দুঃখ খুল্লনা পায় বনে।
কহিতে সে সব কথা পাঁজর বিন্ধে ঘুণে॥
মাধবীতে জনমে মোর কষ্টের অঙ্কুর।
সতিনীর হাতে লাঘব করাইলা প্রচুর॥
কাড়িয়া লইল সতা অঙ্গের আভরণ।
পরিবারে দিল মোরে ভগন বসন॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে প্রভু শুন মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক॥
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে।
ললাটের ঘর্ম মোর পদতলে পড়ে॥
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায়ে আকুল হয়্যা লোটাই আমি ক্ষিতি॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠি আমি চারি ভিতে চাই।
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি যাই॥
শ্রাবণে সঘনে মেঘ বরিষে ঝিমলী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত সৌদামিনী মালী।
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যা ছেলী ধায় চারিভিত।
চলিতে উছটি খাইয়া হই যে মূর্ছিত॥
ভাদ্র মাসেতে প্রভু বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেন কালে ছেলী লইয়া গহন মাঝার॥

কানন মাঝারে প্রভু বাঁচি আমি একা।
গহনে ভ্রমিতে অঙ্গ খাইছে জলোকা॥
আশ্বিন মাসেতে প্রভু জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয়॥
বীণা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত।
সতিনীর ভয়ে আমি সদাই চিন্তিত॥
(গিরি-সুতা-সুত মাসে শুন মোর দুখ।
শাশুড়ী ননদী নাই ডাকিতে সমুখ॥)
উঠিয়া দাণ্ডাইতে মোর গাত্রে নাহি বল।
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া খাই বন-ফল॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে প্রভু শীত পড়ে বেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হৈল শেষ॥
দেহের অম্বর চাহি শীতের কারণ।
ক্রোধ হয়্যা সতিনী যে মারিল তখন॥
পৌষ মাসেতে প্রভু হেমন্ত প্রবল।
শীতে জড়সড় অঙ্গ অত্যন্ত বিকল॥
ওষ্ঠ অধর অঙ্গ মোর কম্পিত সঘন।
হেন সাধ করে মনে পোহাই হুতাশন॥
মাঘ মাসেতে প্রভু গুরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে বিন্ধে শীতে শোষয়ে শোণিত॥
ক্ষৌমবাস পাতি থাকি ঘর ঢেঁকিশালে।
রজনীর শীত ছাড়ে রবি কর জালে॥
ফাল্গুন মাসেতে সাজি আইল ঋতুপতি।
নিজ পরিবারে লয়্যা আপন সঙ্গতি॥
ভ্রমরের গুঞ্জরণে কোকিলার নাদে।
বিরহের শরে মোর হৃদয় দগধে॥
মধুমাসেতে প্রভু শুন তত্ত্ব বাণী।
অরণ্যের মধ্যে মোর সহায় ভবানী॥
সতিনী আনিল মোরে করিয়া আদর।
খণ্ডিলা সকল দুঃখ আইলা সদাগর॥
খুল্লনায় যত কহে প্রভুর চরণে।
দুয়ারে থাকিয়া সব লহনায় শুনে॥ (ঐ)

শিবের সমুদ্রমন্থনে যাত্রা

কাশীরাম

পার্বতীর কটুভাষ শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস
টানিয়া আনিল বাঘবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি বাঁধিল কাঁকালি বেড়ি
তুলিয়া লৈল যুগপাশ॥
কপালে কলঙ্ক-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কণ্ডুকি-কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয়-দহন॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজূটে।
রজত-পর্বত-আভা কোটি চন্দ্র-মুখ-শোভা
ফণি-মণি বিরাজে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ
ত্রিশূল ভ্রূকুটি লইলা করে।
পদভরে ক্ষিতি টলে হুংকার ছাড়িয়া চলে
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে॥
ডম্বরুর ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হইল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে।
অমর-ঈশ্বর ভীত আর সবে সচিন্তিত
এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে॥
বৃষভ সাজায়ে বেগে নন্দী আনি দিল আগে
নানা রত্ন করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ যেন কদলীর পাত
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ॥
আগু-দলে সেনাপতি ময়ূর-বাহনে গতি
শক্তি করে ধরি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন॥
বামে নন্দী মহাকাল করে শূল গলে মাল
পাছে জ্বরাসুর ষট্‌পদে।

চলিলা দেবের রাজ দেখিয়া শিবের কাজ
তিন লোকে গণিল প্রমাদ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে উত্তরিলা সহ দলে
যথায় মথনে সুরাসুর।
কাশীরাম দাস কয় শীঘ্রগতি প্রণময়
সর্ব দেবে দেখিয়া ঠাকুর॥—(মহাভারত)

বিপ্রবেশে অর্জুন

হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কার্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভা-মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী সেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিংবা করি অনুমান॥
মনে মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেউ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥

ভুজযুগ নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগ্ম বর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত॥
লয় মনে এই জনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম অশক্য॥
(মহাভারত)

বংশীধ্বনি-শ্রবণে

যদুনন্দন দাস

কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনা মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যধন
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র ভরিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥

ভাবসম্মিলন

রাধামোহন

মথুরা সঞে হরি   করি পথ চাতুরি
মীলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম-পশু পাখিকুল   বিরহে বেয়াকুল
পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
বরজ-নারিগণ,   বিরহে অচেতন,
পুলকিত পাওল পরাণ।
দাব-দগধ যেন   ছটফটি জীবন
যৈছন অমিয়া-সিনান॥
দেখ রাধা-মাধব মেলি।
দরশে পুলক দেহ   ঘামহি নদী বহ
চীত-পুতলি সম ভেলি॥
কাঁপয়ে ঘন ঘন   অনিমিখ-লোচন
চরকি চয়কি পড়ু লোর।
কহইতে থর থর   থকিত কণ্ঠ-স্বর
দুহুঁ বিবরণ দুহুঁ ভোর॥
হোই সচেতন   কি কহিব নাহি জান
যৈছন দারিদ-হেম।
এ রাধা মোহন কহ   ইহ অনুপম নহ
প্রাণদ ঐছন ক্ষেম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ

জগদানন্দ

গৌর কলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু, হেমমহীধর-শিখর চামর দেই উর পর ডারি॥
পীন উর উপনীত কৃত উপবীত সীতিম রঙ্গ।
জনু, কনয়া ভূধর বেঢ়ি বিলসই সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গ॥
আধ অম্বর আধ সম্বর আধ অঙ্গ সুগোর।
জলদ সঞে জনু, বালরবি-ছবি নিকসে অধিক উজোর॥
জগত আনন্দ পহুঁক পদনখ লখই ঐছন ছন্দ।
জনু, মীনকেতন করু নির্মঞ্ছন চরণে দেই দশচন্দ॥

বর্ষা

দুঃখী শ্যামদাস

অবনীপালন হেতু আইল বরষা ঋতু
ঝড়বৃষ্টি লইয়া মেঘজালে।
তর্জনগর্জন রঙ্গে ঝঞ্জনা চিকুর সঙ্গে
প্রকাশিল গগনমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড প্রবল রবি তাপিত আছিল ভূমি
অষ্টমাস কষ্টনিবন্ধন।...
তাহা জানি জলধরে মিত্র যেন হিত করে
ঘোর শব্দে কৈল বরিষণ॥
জীমূত বরিষে সুখে নির্ঝরপর্বতবুকে
জলে পূর্ণ হইল অবনী॥
ধ্বজপতাকার প্রায় প্রবল লহরী ধায়
খরস্রোতে বহে তরঙ্গিণী॥
সরিৎ-দীর্ঘিকা-কূপ জলে ভেল পূর্ণরূপ,
যোগী যেন তপস্যার ফলে।
তেয়াগিয়া ভোগসুখ কামনা কুটিল দুখ
মহাসুখ ভুঞ্জে পরকালে॥
যেমন ব্রাহ্মণ জন্মে রত হইয়া ব্রহ্মকর্মে
নিষ্ঠাব্রতী সদা-সদাচার।
কর্মযোগ তেয়াগিয়া গোবিন্দভজন লৈয়া
মধুরস করেন আহার॥
সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডধারী বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী
তনুমন নিবেশি গোবিন্দে।
জিতেন্দ্রিয় সদাশয় ভজনে আনন্দময়
মধুপ যেমন মকরন্দে॥
জলধর দিল দান জড় জগতের প্রাণ
তরু সুপল্লব চারু ডালে।
কমল বৈভব জলে মধু পিয়ে অলিকুলে
জলজন্ত আনন্দে আস্ফালে॥
আইল বরষা ঋতু সবার আনন্দ হেতু
যেন সতী পতি পাইল কোলে।
ভাগবত মহাজন দৃঢ় ভক্তি করি যেন
সুখী হয় হরিপ্রেমজলে॥ (গোবিন্দমঙ্গল)

অন্তিম কামনা

শশিশেখর

শিতল তছু অংগ দেখি সংগ-সুখ লালসে
খোয়ালুঁ কুল ধরম-গুণ নাশে।
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণ সঞে অধিক তুহুঁ রোয়সি রে কাহে সখি
মরিলে হম করিহ ইহ কাজে।
অনলে নাহি দাহবি নীরে নহি ডারবি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজ-মাঝে॥
হমারি দোন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যাম-রুচি-তরু তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস সবহুঁ মিলি নিচয়ে আসি দেখবি
শয়ন তেজি উঠই উষ-কালে॥
সকল পরসংগে মিলি স্মৃতি করবি মোরি সখি
নাম লেই অভাগি ধনি রাই।
ললিতা মতিহার লেহ আপন গলে ধারবি
তোহে নিজ-চিহ্ন দেই যাই॥
বিশাখা সখি বলয় লেহ ইন্দু-রেখা অংগুরি
নাস-আভরণ লেহ চিত্রা।
লম্ব-অবতংস লেহ শ্রুতি-যুগলে ধারবি
সুদেবী অতি নিরমল-চরিত্রা॥
এতহুঁ সংবাদ কহি খোলই সব ভূখণে
দেই সব আলি-গণে বাঁটি।
পাণি-তলে ঘাত বুকে মাথে সভে মারই
শশিশেখর মরত জিউ ফাটি॥

দেবসভায় বেহুলা

ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস

দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লৈয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।
মুগ্ধ দেবদেবী দেখি যেন নৃত্য করে শিখি,
গায় যেন কোকিলের ধ্বনি॥
ঘন ঘন তাল রাখে অঞ্চলে বয়ান ঢাকে,
হাসি হাসি বদন দেখায়।
মুখে গায় মিষ্টি বোল, খদির কাষ্ঠের খোল,
তাথই তাথই ঘন বায়॥
আগুতে পাছুতে গিয়া নাচে ঘন পাক দিয়া,
চরণেতে বাজিছে ঘুঙুর।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘন ঘন
মুখে গায় বচন মধুর॥
করে কাংস্য করতাল, বলে ধনী ভাল ভাল,
কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে বেহুলা নাচনী নাচে
প্রাণপতি জীয়াইবে কাজে॥
থাকি থাকি পদ ফেলে, মরাল গমনে চলে,
মুখ জিনি পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল, বেহুলার মিষ্ট বোল,
মোহ গেল যত স্বর্গবাসী॥
এক দৃষ্টে দেবগণ সবে করে নিরীক্ষণ
বেহুলা নাচেন সুরপুরে।
নাহি হয় তালভঙ্গ মনে বড় বাড়ে রঙ্গ,
প্রমত্ত ময়ূর যেন ফিরে॥
রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গ নাড়ে ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে,
এইরূপে গায় বিনোদিনী।
নৃত্যগীতে মন মোহে, যতেক দেবতা কহে,
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী॥
দেবতা সভায় শিব জিজ্ঞাসেন দিয়া দিব
বেহুলার পূর্ব পরিচয়।

কেন নাচ সীমন্তিনী, তুমি বল মোরে ধনী,
সত্য কহ না করিহ ভয়॥
এ কথা শুনিয়া রামা নৃত্যগীতে দেয় ক্ষমা,
দেবতাসভায় কয় কথা।
মনসামঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত,
নায়কের হবে বরদাতা॥ (মনসামঙ্গল)

বাণীবন্দনা

ঘনরাম

করিয়া প্রণতি স্তুতি বন্দি মাতা সরস্বতী
বিশ্বপতি বিষ্ণুর দুর্লভা।
ধবল কমলাসনা ধৌত ধুতি পরিধানা
কুন্দকান্তি কলেবর শোভা॥
গলে দোলে মণিহার কি দিব তুলনা তার
অংশু করে অন্ধকার দূর।
যেখানে যে শোভা পায় রত্ন আভরণ গায়
চিত্তচোর চরণে নূপুর॥
বৈণিক পুস্তক ন্যস্ত মণ্ডিত মায়ের হস্ত
অঞ্জনে রঞ্জিত সুলোচনা।
কৃতাঞ্জলি করি কর বন্দে যাঁরে নিরন্তর
ব্রহ্মা হরি হর হৃষ্টমনা॥
তোমার চরণ দেবী আদরে একান্ত সেবি
মহাকবি ব্যাস আদি যত॥
মোক্ষদ পাতক-অন্ত প্রকাশিলা নানাগ্রন্থ
বেদাঙ্গ পুরাণ ভক্তিমত॥
দেবতা গন্ধর্ব নাগ আদি যত মহাভাগ
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
গৃহী যতি বানপ্রস্থ পদে শির করি ন্যস্ত
শ্রুতিমন্ত্রে পূজে পুটপাণি॥

অখিলে অতুল্য ভাগ্য জন্মিয়া জীবন শ্লাঘ্য
সেই ধন্য সংসার ভিতরে।
করতলে তার স্বর্গ অনায়াসে চতুর্বর্গ
তুমি কৃপা কর যেই নরে॥
তোমার অকৃপা যায় মূর্খমতি বলি তায়
সভায় সে শোভা নাহি পায়।
নিবাসে নাহিক সুখ কুকর্মে পাষাণ বুক
মান অপমান সম তায়॥
হেন মূর্খ মিথ্যাজ্ঞানী আমি কি তোমারে জানি
পতিত-পাবনী নাম শুনি।
আসরে আসিয়া উর দাসের এ আশা পুর
মোর কণ্ঠে বৈস গো জননী॥
তাল মান গান যন্ত্র না জানি লিখন মন্ত্র
তুমি মোরে যন্ত্র করি গাও।
ঘনরাম নিবেদন ঃ ধরি তব শ্রীচরণ
করুণ নয়নকোণে চাও।—(ধর্মমঙ্গল)

সত্যের মহিমা

কতেক কাতর উক্তি কহেন কর্পূর।
কালি সত্য করে কেন আজি কর দূর॥
পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্বত উপর॥
অগ্নি শীতল হয় প্রচলে পর্বত।
তথাপি সজ্জন বাক্য নহে অন্য মত॥
জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি।
পার্থ প্রাণ দিতে গেল চিতানল জ্বালি॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ পুরাণে প্রমাণ।
সত্য পালি সংসারে দাঁড়াতে নাহি স্থান॥
সপ্তদ্বীপা দান দিল দক্ষিণার তরে।
বনিতা বালক বন্দী ব্রাহ্মণের ঘরে॥
মহারাজ দশরথ সত্যের কারণে।
ত্রিলোকের নাথ রামে পাঠাইল বনে॥
বিভীষণ সুগ্রীবের রাজস্ব সত্য পালি।
কোথা গেল দুর্জয় বানররাজ বালী॥
বলি যে পাতালে গেল প্রমাণ পুরাণ।
হেন সত্য করি দাদা কেন কর আন॥ (ঐ)

উমা ও মেনকা

রামেশ্বর

ঘর যেতে হর চায় গৌরী গিয়া কহে মায়
শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস শুনি যেমন কৌশল্যা রাণী
কলস্বরে করেন রোদন॥
সুখময়ী রাজকন্যা ভিক্ষু-গৃহে দুঃখ-বন্যা
কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়।
এই দুঃখে মরি আমি পরাণ-পুত্তলি তুমি
কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায়॥
পাইনু পরম সুখ পাসরিনু সব দুখ
নিরখিয়া তুয়া মুখচাঁদে।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে ধরিব হিয়া
মনের সহিত প্রাণ কাঁদে॥
বসাইয়া বরাসনে পালিব পরাণ পণে
মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যত কাল জীব আর তোমা না পাঠাব
ফলভারে নাহি ভাঙ্গে ডাল॥
ননীর পুতলী ছেলে জ্বলন্ত অঙ্গারে ফেলে
বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডিতে পারি
কপাল খণ্ডন নাহি যায়॥
গৌরীর গলায় ধরে বিস্তর বিলাপ করে
জননী কান্দিয়া মোহ যায়।
মুছিয়া বদনখানি বলিয়া মধুর বাণী
পার্বতী প্রবোধ দেয় মায়॥
স্বামি-ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ-মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।
বিদায় করহ বল্যা পার্বতী প্রণতা হৈলা
না কান্দ মাথার দিব্য দি॥ (শিবায়ন)

লীলার বিলাপ

পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা

আহা কঙ্ক! কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায়?
তোমার মালঞ্চে ফুল বাসি হৈয়া যায়।
পূবেতে উদয় রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও—
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখা কি না পাও?
এমন অন্ধাইর নাই তোমার আলো নাহি পশে;
যাওয়া আসা, ঠাকুর, তোমার আছে সর্বদেশে;—
কহিও কহিও, ঠাকুর, তুমি দিনমণি,
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও;
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিয়ো।

শুন রে বিদেশী ভাই, মাঝীমাল্লাগণ,
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ;
পাহাড়ে পর্বতে যাও তরণী বাহিয়া,
লাগাল পাইলে কঙ্কে আনিও কহিয়া!
যাহার লাগিয়া রে আমি হইলাম উন্মাদিনী,
নদীর কিনারে বসি রই একাকিনী;
দিবস না যায় রে মোর না পোহায় রাতি,—
মনোদুঃখ কইও কঙ্কে জানাইও মিনতি।
আর কইও কইও রে দুঃখ বন্ধুরে জানাই
মরিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই।

শুন, শুন, নদী আরে শুন আমার কথা,
তুমি তো অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা;
তুমি তো দরিয়া রে নদী কূলে তোমার বাসা,
তুমি জান কঙ্ক-লীলার মনের যত আশা;
তুমি জান কঙ্ক-লীলার ভালবাসাবাসি—
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।
কত দেশে যাও রে নদী বহিয়া উজান—
কোথাও কি শুনিতে পাও সেই বাঁশীর গান?

পাহাড় পর্বতে, রে নদী, তোমার যাওয়া আসা—
অভাগীরে ছাড়িয়া বন্ধু কোথায় লইল বাসা?
লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা—
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা।
নিশ্বাসে শুকায় রে নদী, কান্দি গলে শিলা—
প্রাণে মাত্র এই ভাবে বেঁচে আছে লীলা।
সেও তো বেশী নয় রে নদী, দিন যায় চলি,—
মরিবে অভাগী লীলা আজি কিম্বা কালি।
মরবার কালে দেখ্যা পাইতাম যুগল চরণ;
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুঃখের বিবরণ।

রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্দ্র তারা—
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা?
জাগিয়া পোহাইছি নিশি—তোমরা ত জান—
কোন্ দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান।
সপ্ত সাগর-তীরে পর্বত অচলে—
যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে।
অতি উচ্চে কর বাস, পাও ত দেখিতে—
বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন পথে?
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন—
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন।
সে রত্ন খুঁজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই;
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই।
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি—
কোন্ দেশে উড়িয়া গেল পিঞ্জরের পাখী?
এমন নিষ্ঠুর বিধি, নাহি দিল পাখা—
উড়িয়া বন্ধুর সঙ্গে করিতাম দেখা।

দিবস রাতির সাক্ষী তোমরা, তরুলতা,
তোমরা কি জান আমার কঙ্ক গেল কোথা?
বল বল, তরুলতা, রাখ আমার প্রাণ,
দয়া করি বল তার পথের সন্ধান।
আর যদি জান রে, বল—যাইবার কালে
অভাগী লীলার কথা গিয়াছে কি ব'লে?

পিঞ্জিরাতে সারীশুক গান করে ব'সে,
নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে—
"তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমন?
ক্ষীর-সর দিয়া, পাখি পালিল যে জন—
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ?
এত যে বাসিয়া ভাল পালিল সকলে,—
কি বলিয়া গেল বঁধু যাইবার কালে?
কোন্ দেশে যাবে রে বলি' কহিল ঠিকানা—
অবশ্য তোমাদের, পাখি, কিছু আছে জানা।"
ধরিয়া সারীর গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া—
"আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া।
উড়িয়া যাইতে, রে পাখি, আছে তোমার পাখা,
একদিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা।"

উড়ায়ে খাঁচার পাখী বলে লীলাবতী,
"ফিরায়ে কঙ্করে মোর আনহ ঝটিতি।
উড়িয়া যাও, হীরামন তোতা, উঠ রে আকাশে,
শীঘ্রগতি চল মোর বন্ধু যেই দেশে।
দেখিলে শুনাইও আমার দুঃখের গান,
বলিয়া কহিয়া আনি বাঁচাও লীলার প্রাণ;
সম্পদ কালেতে পাখি, পালিল তোমায়,
ভুলিতে এমন জনে কভু না জুয়ায়;
পৃথিবী ভ্রমিয়া পক্ষী করিও সন্ধান,
বারতা আনিয়া তাহার বাঁচাও লীলার প্রাণ।

রতি-বিলাপ

ভারতচন্দ্র

পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু-থালু কেশ-বাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসারে পূরিল হাহাকার।
কোথা গেল প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
বিপরীত এ নহে বিধান॥
না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী পাছেতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি॥
আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই॥
শিব শিব শিব নাম বলে সবে শিবধাম
বামদেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরেক কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন॥
অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি
মদন মরিলে মৈল রতি।

এ দুঃখ হইতে পার উপায় না দেখি আর
মরিলেও নাহি অব্যাহতি॥
আরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ-রাজীব-রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বহিয়া॥
আরে রে মলয়-বাত তোতে হউক বজ্রাঘাত
মরে যারে ভ্রময়া কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা॥
কোথা গেলা সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার ধর্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্ত কালে কর এই কর্ম॥
বিরহ-সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহীর শাপে॥

(অন্নদামঙ্গল)

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠী পূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া ঘুঁটে কাঠ কুড়াইয়া
বেচিয়া বাঁচায় বাপ-মায়ে॥
একদিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথন রঙ্গে
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে॥
মনে হল পূর্ব কথা আপনি আসিয়া তথা
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাঠ খড় জড়াইয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি॥
হরিহোড় যেথা যায় কাঠ ঘুঁটে নাহি পায়
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
বুড়ীটিকে দেখিতে পাইলা॥
দেখেন বুড়ীর কাছে ঝুড়ি ভরা ঘুঁটে আছে
বোঝা বান্ধা কাঠ আছে তায়।
হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
আজি বড় দেখি অনুপায়॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুঁটে লয়ে ঝুড়ি ভরি
সর্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার॥
বৃদ্ধ পিতা-মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু মিছে বেলা মজাইনু
এ ছার জীবনে কিবা ফল॥

দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
ওরে বাছা না পারি বহিতে॥
মঙ্গল হইবে তোর অতি দূরে ঘর মোর
ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্ধেক আমার হবে অর্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরিহোড় এত শুনি অর্ধলাভ মনে গণি
মাথায় লইয়া ঘুঁটে ঝুড়ি।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে লড়ী ধরে থেকে থেকে
আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘর নহে অতি দূরতর
সাঁজ হৈল সেখানেতে যেতে।
তাহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া
কহেন চলিতে নারী রেতে॥
কহিলা মধুর সুরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাতে
ঠাঁই নাই হয় চারি জনে॥
অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চার প'র দিন অন্নবিনা আমি ক্ষীণ
যম-যোগ্য অতিথি এ ঘরে॥
হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী
আরে বাছা না ভাবিও দুখ।
ভারতে সান্ত্বনা করে অন্নদা আইল ঘরে
ইতঃপর পাবে যত সুখ॥

(অন্নদামঙ্গল)

প্রসাদী

রামপ্রসাদ

(১)

মন, তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে॥
জাঁক-জমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকাকলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে?
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড়-লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে?
তুমি মনোময় মাণিক্য জেবলে দেও না, জবলুক নিশিদিনে॥
মেষ-ছাগল-মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে,
তুমি 'জয়কালী' 'জয়কালী' বলে, বলি দেও ষড়্রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলে কাজ কি রে তোর সে বাজনে?
তুমি 'জয়কালী' বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

(২)

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটী কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কী মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জবালা দিতে পারে নিভাইয়ে?
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য, আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে?

(৩)

যাওগো জননি জানি তোরে।
(আমি জানি তোরে পাষাণের মেয়ে)।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদী করে।
পেয়েছ পিতার ধর্ম বুঝিলাম কর্মের ব্যবহারে॥
এমন হাবাতে নির্দয় মা দয়াময়ী নাম ধরেছ কোন্ বিচারে।
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অল্পে কিরে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আল ভেঙে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
চোখে আঙ্গুল না দিলে পরে, দেখ্‌বি না মা বিচার করে।
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে॥
যে দু'কথা শোনাতে পারে, যে জন হেতের ধরে,
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে।
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, যদি কৃপাকণা ঝুরে।
সাধ রে শ্যামার রাঙা পদ এ নব ইন্দ্রিয় পুরে॥

(৪)

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ সেথায় তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা হয়রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিন্ড দান বল্লে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে ম্লোলেই মুক্তি এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল যে ভক্তি মুক্তি হয় মন তারই দাসী॥
নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে করুণানিধির বলে
ওরে চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে সে এলোকেশী॥

শুক-সারী সংবাদ

গোবিন্দ অধিকারী

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ।
নইলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল।
নইলে পারবে কেন?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা।
ঐযে তা যায় দেখা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে।
চূড়া তাইত পড়ে হেলে।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি,
সারী বলে, আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী।
সে তোমার কৃষ্ণ জানে।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান,
সারী বলে, সত্য বটে, সেও রাধার নাম।
নইলে কি তার দাম?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
সারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু,
নইলে কে কার গুরু।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদম তলায় থানা,
সারী বলে, আমার রাধা করে আনাগোনা,
তাতেই গেল জানা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ এই জগতের প্রাণ
সারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান।
আপনি থাকে প্রাণ?

প্রতীক্ষা

মদন বাউল

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?
দেখ্‌না আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া-হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড,তাই ভরসা দণ্ড,
এর আছে কোন্‌ উপায়?
কয় যে মদন, শোন নিবেদন,
দিসনে বেদন সেই শ্রীগুরুর মনে।
সহজ ধারা আপন হারা তাঁর বাণী শুনে
রে গরজী।

পথের বাধা

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চল্‌তে না পাই,—
আমায় রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুর্‌শেদে॥
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ-সাধন মর্‌লো যে ভেদে॥
ওরে প্রেম-দুয়ারে নানান্‌ তালা—
পুরাণ কোরান তসবী মালা,
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা,
কাঁইদ্যা মদন মরে খেদে॥

নন্দ ও যশোদা

দাশরথি রায়

গোপের নারীর মানায় নাতো
মানসিংহের নারীর মতো।
মানের কান্না কাঁদলে তো চলবে না॥
মিছে গোল অমঙ্গল
বেচ ঘোল বেচবে ঘোল।
মাথা মুড়িয়ে ঘোল কেউত তাতে ঢালবে না॥
গোপালকে তুমি পড়াতে চাও,
ঘরের লক্ষ্মী ছাড়াতে চাও,
মহাজনের পথে দিয়ে কাঁটা।
সর্বনাশ কোরো না সতি
আর এনো না সরস্বতী
লিখতে যেতে দিওনা, জেতে দিওনা বাটা॥
যশোদা বলে বিদ্যাহীন
সকলেরই মান্যহীন
মূর্খের যদি লক্ষ টাকা ঘটে,
ঘটে বস্তু না দেখিয়ে
চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে
মূর্খের ধন ভুলায়ে খায় শঠে।
দিচ্ছ উঠ্‌নো বেচছো ক্ষীর
মূর্খ দেখে তোমার আঁখির
মধ্যে আঙুল দিয়ে কত জনা॥
করে লয় হিসাবের ভুল
কারো কাছে বা হারাও মূল,
দয়া করে দেয় দুই এক আনা।
নন্দ বলে, লোকেরি ভুল
গোয়ালার করে হিসাব ভুল?
কেউবা বলে বেটায় দিলাম ফাঁকি।
গোয়ালার কাছে সবাই ঋণী
হাঁড়িতে পুরে পুষ্করিণী
তামামই জল দুধ কতটুক রাখি?

অন্তর্দৃষ্টি

কমলাকান্ত

আপনারে আপনি দেখ যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছ দুয়ারে॥
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ মন উচাটন হয়ো নারে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও না মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে বাজিকরে চিন্‌লে না সে তোমার ঘটেই বিরাজ করে॥

ব্রহ্মময়ী কন্যা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ওহে গিরি, ব্রহ্মরূপা কন্যা বটে, নাহিক সংশয়।
তথাচ অবোধ মন প্রবোধ না লয়॥
মনে ভাবি ব্রহ্ম-ভাব, সে ভাবে না পাই ভাব,
তখনি বাৎসল্য-ভাব অন্তরে উদয়॥
কন্যা-ভাব পরিহরি, মনে করি উমা স্মরি,
অবশেষে কেঁদে মরি ব্যাকুল হৃদয়।
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জ্ঞান,
তারা করে স্তন্য-পান, এই জ্ঞান হয়॥
নিশিতে শয্যায় রই, নিদ্রায় আকুল হই,
স্বপনেতে যদি কই জয় তারা জয়।
আঁচল ধরিয়া তারা, অভিমানে হয় সারা
ফেলিয়া নয়ন-ধারা, কত কথা কয়॥
বলে উমা ছি মা, ছি মা, মাগো ও মা, কর কি মা,
মা হোয়ে এমন করা, উচিত ত নয়।
উমা ডাকে মা মা ব'লে, স্নেহরসে যাই গ'লে,
তখনি করিলে কোলে, যাতনা না রয়॥

ভারতের ভাগ্য-বিপ্লব

ঈশ্বর গুপ্ত

পূর্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব রীতি-নীতি, কোথা ধর্ম প্রতি প্রীতি?
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত॥
দেশের দারুণ দুখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে ম্লানমুখ মসী ছাঁদে
শোক-অশ্রু করে বরিষণ॥
কি ছিল কি হ'ল আহা আর কি হইবে তাহা,
ভারতের ভবভরা যশ?
ঘুচিবে সকল রিষ্টি হবে সদা সুখ-বৃষ্টি,
সর্বাধারে সঞ্চারিবে রস?
সুরব সৌরভ হয়ে দশদিকে যশ লয়ে,
প্রকাশিবে শুভ সমাচার?
স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে ভারতের জরা-দেহে,
করিবে কি শোভার সঞ্চার?
দূর হবে সব ক্লান্তি পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
শান্তিজল হবে বরিষণ?
পুণ্যভূমি পুনর্বার পূর্ব সুখ সহকার,
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন?
প্রবীণা নবীনা হয়ে সন্তান সমূহ লয়ে
কোলে করি করিবে পালন?
সুধাসম স্তন্যপানে জননীর মুখপানে
একদৃষ্টে করিবে ঈক্ষণ?
এরূপ স্বপনমত, কত হয় মনোগত,
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে প্রসূতির হাহারবে,
সুত সবে করে হাহাকার॥

মিত্রাক্ষর

মধুসূদন

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষররূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর' যবে এ নিগড় কোমল চরণে।
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে
ছিল না কি ভাবধন। কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।
কি কাজ পবিত্রি' মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত বাসে?
প্রকৃত কবিতা রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীনা-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন-কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুবা একজন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস বধিতে মোরে কিসের কারণে?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর-বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিল যুবজন ভীম-গরজনে।
পরিবর্তিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীতধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মন স্বর্ণ-বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন মনোহর অতি।
সে দুরন্ত যুবজন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবিকুলপতি।

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো! বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি)
ও-প্রতিমা। নিবাইল, দেখ হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি।
শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল-কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ডুবিল সে তরী
কাব্য-নদে, খেলাইনু যাহে পদ-বলে—
অল্পদিন। নারিনু, মা! চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর-বনে!
এই বর, হে বরদে! মাগি শেষবারে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

সমুদ্রের প্রতি

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জল-দল-পতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কিহে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন গুণে, কহ দেব, শুনি,
কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি প্রভঞ্জনসম
ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বিতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বু-স্বামি,

কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ-জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ জুড়াও এ-জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখোনা গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা

কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি' সতী রাবণের পানে,—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়, দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা-হেতু, তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী,—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধি-বশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্র-ধাত্রী এ কনক-পুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি' বারুইর যথা
ছিন্ন-ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!

এক পুত্র-শোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শতপুত্র শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি। হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুল-শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।”
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব-নন্দিনী,
কাঁদিয়া,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে!
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি,—
“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশ-বৈরী নাশি' রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গ-পুরে; বীর-মাতা তুমি;
বীর-কর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র-পরাক্রমে, তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে?”
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—“দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য ব'লে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
অতুল ভব-মণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূ-তীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলী? কাকোদর সদা

নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।”

দশরথের প্রতি কেকয়ী

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তা'র কভু না সম্ভবে—
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতিগৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণাধ্বনি? কহ, দেব শুনি—
কৃপা করি কহ মোরে;—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যামহিষী
বিতরেন ধনজাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘন্টা ঘটারোলে?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে? রঘুকুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু

যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথী?
* * *
হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি;
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে!
ধর্মশব্দ মুখে, গতি অধর্মের পথে!
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তা'র কাট তুমি আসি,
নররাজ! কিংবা দিয়া চুণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে। যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে!
* * *
ধর্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয়!
তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত ভারত-রত্ন, রঘুচূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব কথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র কহ অপরাধী?
তিন রাণী তব, রাজা, এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি,
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোঁন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তা'র রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর দেব; কার সাধ্য রোধে

তোমার, নরেন্দ্র তুমি! কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কে বা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী। দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব;—যেখানে যাব কহিব সেখানে,—
"পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি!"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,—
"পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি!"

* * *

কোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়া তারা গাহিবে নাচিয়া—
"পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি!"
থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি;—দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি!

মেঘনাদ ও বিভীষণ

"এতক্ষণে" অরিন্দম কহিলা বিষাদে
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে। হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা-সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। শূলি-শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতুষ্পুত্র বাসব-বিজয়ী!
নিজগৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি,

পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ;—"বৃথা এ সাধনা
ধীমন্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য! তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি! ভুলিলে কেমনে,
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস, পঙ্কজকাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু! পঙ্কিল-সলিলে
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র-কেশরী,
কবে, হে বীর-কেশরী! সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ, আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি কোন্ দেববলে
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি।
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের। কি দেখি
ডরিবে এ দাস, হেন দুর্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ! নন্দন-কাননে

ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি! সহিছ কেমনে?”
মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশির ফণী,
মলিন বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ লক্ষ্যি রাবণ-আত্মজে;—
“নহি দোষী আমি, বৎস! বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি। নিজ কর্মদোষে, হায় মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা, রাজা মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?”
রুষিলা বাসবত্রাস, গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপী,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী;—“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ! বিখ্যাত জগতে
তুমি,—কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর! কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য! বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”

দিবাবসানে

রঙ্গলাল

(উমার প্রতি শঙ্কর)

আরক্ত অপাঙ্গধর, তব নেত্রে দিনকর,
পদ্মকান্তি করিয়া স্থাপন।
দিবসে সংহার করে, ধাতা যথা যুগান্তরে
জগতেরে করেন হরণ॥
অস্তমিত দিনকর করে শোভে মনোহর,
তব পিতৃ-পর্বত-নির্ঝর।
ইন্দ্রধনু শোভাচয়, করিয়াছে পরাজয়,
অই দেখ শীকরনিকর॥
চক্রবাক চক্রবাকী, মুখেতে মৃণাল চাকী
গ্রীবাভঙ্গি প্রিয়া-অভিমুখে।
সরোবরে ধীরে ধীরে, ক্রমে গেল দূর নীরে,
বিরহে বিলাপ করে দুখে॥
শল্লকী তরুর ক্ষীর- গন্ধে সুবাসিত নীর,
তাহে অলিবন্ধ সরোরুহ,
সারা দিবসের পরে, সেই নীর পান তরে,
চলিয়াছে মাতঙ্গ সমূহ॥
অই দেখ প্রাণপ্রিয়ে, পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে
অস্তগত ভানু মহোদয়,
দীর্ঘ প্রতিবিম্বচ্ছলে, কেমন সরসীজলে,
রচিতেছে সেতু স্বর্ণময়॥
দীঘল-দশনধর, বরাহ অরণ্যচর
দন্তে ভাঙ্গি বিস-কিশলয়,
প্রগাঢ় পঙ্কেতে যত, তাপ করি অপগত,
ত্যজিতেছে হ্রদের হৃদয়।
হের অই তরু'পর, স্বর্ণ-বর্ণ পুচ্ছধর,
বসে শিখী লয়ে রূপরাশি
দিবা অবসান কালে, দিনকর করজালে,
সেই কি ফেলিল সব গ্রাসি?

ভানুর কিরণ জল, পরিগতে নভঃস্থল,
কিছু শুষ্ক সরসীর প্রায়,
পূর্বদিকে তমোরাশি, ক্রমে সঞ্চারিল আসি
যেন পঙ্ক সম দেখা যায়॥
উটজ অঙ্গনে চলি, যেতেছে কুরঙ্গাবলী,
তরুপুঞ্জ-মূল সিক্ত জলে,
আসে যজ্ঞধেনুগণ, প্রজ্বলিত হুতাশন,
কিবা শোভা আশ্রম সকলে॥
শিহরিছে সরসিজ বন্ধ করি কোষ নিজ
ক্ষণদার আগমনক্ষণে,
তথাপি সে কিছু স্থান ভ্রমরে করিতে দান
রাখিয়াছে প্রীতিফুল্ল মনে।
হৃদয়-সংগত তানে মিলাইয়ে সাম গানে
সহস্রেক বন্দনার সনে,
কিরণোষ্ণপায়িগণ করিছেন সংস্তবন
অগ্নিগত ভানুর কিরণে। (কুমারসম্ভব হইতে)

সূর্য

দীনবন্ধু মিত্র

অরুণের আগমন পাইয়া সন্ধান
অন্ধকার সনে নিশি করিলা প্রস্থান।
উঠ উঠ দিবাকর, কিবা রূপ মনোহর,
অপরূপ আভাময় তোমার বিমান।
ধরা ধনী নীলাম্বর করি পরিহার,
পরিলেন পীতবাস কিরণে তোমার।

নাহি আর অন্ধকার, কোথা পলাইল?
গিরীশ-গহ্বরে বুঝি গিয়ে লুকাইল।
কতক ভানুর ডরে কাফ্রীর কলেবরে,
কতক কামিনী-কেশে এসে মিলাইল।

অবশিষ্ট অন্ধকার অন্ধকূপে যায়,
খলের হৃদয়ে গিয়া অথবা মিলায়।

মধ্যাহ্নে মিহির তব করাল কিরণ।
ফিরাইতে তব পানে পারি না নয়ন।
কর রশ্মি বিতরণ, হয় তায় বরিষণ,
অনল কণিকাপুঞ্জ উত্তাপ ভীষণ।
সে সময় সুশীতল তরুর ছায়ায়
বসিলে দূর্বার দলে জীবন জুড়ায়।

দে জল দে জল বলি ডাকে চাতকিনী
পিপাসায় প্রাণ যায় তবু পাতকিনী
খাবে না নদীর নীর, নীরদ হইতে ক্ষীর,
পড়িবে জুড়াবে যবে তাপিত মেদিনী
উড়িয়া উড়িয়া পিয়া জুড়ায় জীবন।
স্বভাব-অঙ্কিত রেখা কে করে লঙ্ঘন।

অপার মহিমা তব আদিত্য মহান্,
পৃথিবীর পয় লয়ে পৃথিবীকে দান।
আতপে তাপিয়ে জল, উঠাইয়ে বাষ্পদল,
নবীন নীরদকুলে কর নিরমান।
বারিরূপে বারিদের ধরায় পতন,
ফিরে তার কোলে যেন আসে হারা ধন।

তেজঃপুঞ্জ ত্বিষাম্পতি প্রচণ্ড প্রতাপ,
ক্ষুদ্র রাহু করে গ্রাস এ বড় প্রলাপ!
লোকে করে হাহাকার, দিবসেতে অন্ধকার,
তপন-নিধন হায় একি পরিতাপ!
পুনঃ প্রকাশিত তুমি, পৃথ্বী প্রভাময়,
লুকোচুরি খেলা তব গ্রহণ ত নয়।

যমুনা তনয়া তব শ্যামল-বরণ,
বিরাজিত তটে তার সুখ-বৃন্দাবন;

যমুনার উপকূলে, লইয়ে গোপিনীকুলে
করে কেলি বনমালী মুরলীবদন।
সুবাসিত স্বচ্ছ বারি শীতল পাবন,
স্নানে পানে পরিতৃপ্ত গোপগোপীগণ।

হয়ত সবিতা তুমি সহ গ্রহগণ,
শ্রেষ্ঠতর সূর্যে বেড়ি করিছ ভ্রমণ;
তোমার সমান কত, ঘোরে ভানু অবিরত,
গ্রহ সহ সেই সূর্যে করিয়া বেষ্টন;
শ্রেষ্ঠতর সূর্য বুঝি স্বদল লইয়া
ভ্রমিতেছে শ্রেষ্ঠতম তপনে বেড়িয়া।

বিশ্বরূপ

বিষ্ণুরাম

(গান)

এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে
তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ॥
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার 'দয়াল' নামটি লেখা,
সুন্দর নামটি বিহঙ্গ-অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ॥
চন্দ্রাতপতুল্য গগন-মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল;
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম অঙ্কিত ক'রেছ॥
জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন,
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ময় নামে জগৎ দেখাতেছ॥

ভূস্তরে, প্রস্তরে, তাবৎ চরাচরে
সর্ব্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে;
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে;
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ॥
হৃদয়ে লিখেছ 'হৃদয়-বল্লভ,'
প্রেমসূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব,
ত্বন্নামে অঙ্কিত তোমারিত সব
হাতে কলমেতে ধরা যে পড়েছ॥

(সঙ্গীত মুক্তাবলী)—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

আদি কবি

বিহারীলাল

হিমাদ্রি-শিখর 'পরে আচম্বিতে আলা করে
অপরূপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য তপোবন।
বিকচ নয়নে চেয়ে হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী তরুণ ঊষা কুমারী-রতন।
অম্বরে অরুণোদয়, তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে;
নিরখি লোচনলোভা পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।

শাখি-শাখে রস-সুখে ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দু'জনায়;
হানিল শবরে বাণ, নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়!

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে!
চক্ষে করি' দরশন জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাটভাগে জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

কিরণে কিরণময়, বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়, সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!
কিরণ-মণ্ডলে বসি, জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী—
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা-মেয়ে;
নামিলেন ধীর ধীর, দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে!

করে ইন্দ্রধনু বালা গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে ঝল্‌মলে কানন।
কর্ণে কিরণের ফুল দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।
হাসি-হাসি শশিমুখী, কতই কতই সুখী!
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল-ঢল, কভু রোষে জ্বল-জ্বল,
বিলোচন ছল-ছল করে প্রতিক্ষণে।

করুণ ক্রন্দন রোল উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে;
হেরিলেন রক্তমাখা মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্নপাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে!
একবার সে ক্রৌঞ্চীরেঁ, আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী!
কাতরা করুণাভরে, গা'ন সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী!
সে শোক-সঙ্গীত-কথা শুনে কাঁদে তরুলতা
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি গদ্‌গদ আদিকবি
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া যায়।

সারদা

বিহারীলাল

তোমারে হৃদয়ে রাখি সদানন্দ মনে থাকি
শ্মশান অমরাবতী দুই-ই ভাল লাগে,
গিরিমালা, কুঞ্জবন, গৃহ, নট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে, ঘুমালে ঘুমাও শেষে
স্বপনে মন্দার-মালা পরাইয়ে দাও গলে॥

যত মনে অভিলাষ, তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি;
ভক্তিভাবে একতানে, মজেছি তোমার ধ্যানে;
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।
থাক হৃদে জেগে থাক, রূপে মন ভোরে রাখ
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ-নগর-কোলাহলে।

তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই;
করুণা-কটাক্ষে তব পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে কদিন আছে প্রাণ করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণ তলে॥

জননী

সুরেন্দ্রনাথ

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর, সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ!
তুমি পরশিলে করে, জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কাশূন্য বৈকুণ্ঠ সমান!
তুমি মুখে দিবে যাহা, মৃত্যুহরা সুধা তাহা,
আশীর্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ!
তব কাছে স্বর্গবাস, তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় কি ধর্ম তব সেবার সমান?

ধরা হীরা হলে হায় সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায়!—
ফুল হয় তারাদল, চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি যদি পূজি তব পায়!—
সুধাকর সুধাগারে, পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন!—
পারিজাত-দল দিয়া, নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন!—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন॥

তুমি মা! না ধর দোষ, তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায়!
শত অপরাধ করে তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায়!
বাণী বর্ণিবারে চায় শেষ যদি সদা গায়,
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান!
হে সুর, অসুর, নর, যেবা তনু বুদ্ধি ধর;—
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান।—

সখীর প্রতি শচী

হেমচন্দ্র

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ বনে
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কতদিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন;
থাকিব লো মরতে পড়িয়া!
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥
স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই
দেবের স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রত সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি যদি হ'ত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া;
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া!
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে, চপলা, বল, নিবাসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন।
মানবের এ আগারে থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে!
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবন্ধ নিগড়ে!
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে!
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিক্ বহ্নিময়
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে!

হায় এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ!
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্বকাল
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ!
অনন্ত যৌবন লয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ;
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা
নরলোকে সহিয়া এ দুখ!
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো নরের পরাণ!
বরং সে ছিল ভাল নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বপ্ন নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে!
জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহাঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্বংসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য় খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে॥
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে?
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্মুক ধরি করে;
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস, কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে!
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে!
হইত কেমন ঘন মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলাত পবনে!
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী
দেবের পরশ সুখকর।

চলেছে নয়নতলে, উছলি মধুর জলে
ভাবিতে তা হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্য এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন বিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন!
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম,
দৈত্য-জায়া পরিছে গলায়!
যে পুষ্প শচীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায়!
সখিরে দানব জায়া, ধরি কলুষিত কায়া
বসিছে সে আসন উপরে;
যেখানে অমরীগণ ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে!
হায় লজ্জা, চপলা রে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা!
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহিলো এ প্রাণে!
এতদিনে দৈত্যবালা এমুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষ বাণে!
সাজে যা আমারে সাজে, আমার সপ্তকী বাজে
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!
আমার মুকুট-রত্ন অমরে করিত যত্ন
কুবের আনিয়া দেয় তায়!
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই!
কোথায় পলাব বল? কোথা আছে হেন স্থল?
এ মুখ না দেখাব কাহারে;
বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে!

জীবন-মরীচিকা

হেমচন্দ্র

জীবন এমন ভ্রম কে আগে জানিত রে—
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে?
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা-আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব বেশ
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে;
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে!
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি' স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী-ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লুত
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময়, সংসারে।
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুম গন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল, সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোগত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, ল'য়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্নদুর্গ-প্রাকারে।

যমুনা-লহরী

গোবিন্দচন্দ্র রায়

নির্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে। ও।
কত কত সুন্দর নগরী তীরে রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা, পরকাশিল, লয় পাইল ও।
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি মরমে পরশে কথা, ভূত সে ভারতগাথা ও।
তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা, গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব-নীরব, রে যমুনে সব, গত যত বৈভব, কালে ও।
তব জল-তীরে, পৌরব যাদব পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা উড়িতে দেশ বিদেশে ও;
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
কভু শত ধারে, এ উভ পারে, পাঠান-আফগান-মোগল, ও।
ঢালিল সেনা, গ্রাসি নিবাসী, বাঁধিল ভারতে বন্ধনে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত, পর অসি-ঘাত নিপাতে ও।

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়, ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল, স্থাপিল, শাসিল রাজ্য, প্রাসাদ রচি পরিপাটী ও।
কত শত দুর্জয়, দুর্গম দুর্গে, বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে চির-সুখ-সম্ভোগ আশে ও।
ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার সুরূপে, দিক্‌দিক্ হইতে, কর্ষে মনুজ-সমাজে ও।
কত নর-পঞ্জরে, নির্মিল ইহারে, শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব দর্শক লোকে প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

অলকাপুরী

দ্বিজেন্দ্রনাথ

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোমা মত,
দেখিবে হে গিয়া অলকায়;
তোমার তড়িতমালা, সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভা কিবা দুজনায়;
তোমার গর্জন-স্বর শুনিতে কি মনোহর
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায়;
তোমার অন্তরে জল প্রকাশিছে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায়;
ইন্দ্রধনু তব দেহে, অলকার গেহে গেহে
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ;
হর্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ।
আলো করি গৃহমাঝে বধূগণ কিবা সাজে—
কুসুমের অলংকার গায়।
সেসব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে
কোথা ছিনু এসেছি কোথায়।
পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ 'পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে;
কপোল-চুম্বন-লোভে অলকেতে কুন্দ শোভে,
কদম্ব বিরাজ কেশপাশে;
সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমরকুল
ঋতুর শাসন সব টুটি;
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাসি হাসি মুখ
কমলিনী সদা রহে ফুটি।
ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হয়ে কেকারবে
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে
নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া।
হর্ষ বিনা অশ্রুধারা জানেনা কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।

যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ-হুতাশ।
কুবের-আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহিরদ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস-হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে
যাইতে মানসসরে, করো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি একধারে গিরি-সম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণকদলী তরু চারিধারে শোভে চারু
তোমায় তড়িত যেন সাজে।
মাধবীমণ্ডপ 'পরে কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটে অলিকুল।
লতায়-পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ—অশোক বকুল।
অশোক ভাবিছে মনে পাব আমি কতক্ষণে
বধূটির চরণ-আঘাত।
কবে আমি পাব মিঠা মুখ-মদিরার ছিটা
বকুল ভাবয়ে দিবারাত।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি'
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রন রন বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সেসব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।

এসকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে
দেখে মাত্র মোর বাড়ি পানে।
এবে উহা শূন্যপ্রায়, কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস অবসানে।

ব্যাকুলতা

গিরিশচন্দ্র

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন;
এ কেমন ঘোর, হ'বে নাকি ভোর?
অধীর অধীর যেমতি সমীর—
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই!
জানিনা কে আমি, এসেছি কোথায়,
কোথায় চলেছি, কেবা নিয়ে যায়!
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনই নাই।
কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল।
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন,
যে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
তব পদে তাই শরণ চাই।

রাণীর মত

নবীনচন্দ্র

'রানীর কি মত?' শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন,—

"মহারাজ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন।
মোগল-গৌরব-রবি, আরঙ্গজিব সনে
অস্তমিত; নহে দূর দিল্লীর পতন।
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাশি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে।
বঙ্গদেশে এই দশা—বৃটিশ-কেতন
উড়িছে ফরাশি দুর্গে হাসিয়া অম্বরে!
ক্ষুব্ধসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে বসিয়া বিবরে

"চিন্তে মনে মনে যথা, ক্লাইভ তেমতি
আক্রমিবে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ।
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি
বর' তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত। যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে; মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে? হবে পরিণত
দাবানলে; না পারিবে এই ভীমানল
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।

"বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা; সমস্ত ভারতে
বৃটিশের তেজোরাশি, বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধূচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার,

বৃটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে। যেই শশী তারাগণে
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে।

"জ্ঞানহীন নারী আমি, তবু মহারাজ!
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দুল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ! ভেবে মম শরীর শিহরে।

"বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে,
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গলায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায়!
মেঘমুক্ত হবে কিবা তেজস্বী বিপুল।
স্বাধীনতা-আশালতা, মুকুলিত প্রায়
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল
প্রভাবে তাহার; নাহি জানি অতঃপর
উঠিবে কি মহাঝড়,—এ কি ভয়ঙ্কর!"

"অতএব মহারাজ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ; ষড়্যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন?
'রাণীর কি মত?'—শুন আমার কি মত;—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়!).

নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

"আমার কি মত? তবে শুনুন মহারাজ।
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ' সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীম অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃদুঃখ? সত্য, শেঠবর!
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তারে
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
প্রগল্ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার!"

কৃষ্ণার্জুন

নবীনচন্দ্র

অর্জুন—এ মহা নিষ্কামধর্ম জগতে প্রচার
যদি মহাব্রত তব, কি কাজ, মহানুভব,
ভারত সাম্রাজ্যে তবে? যে রাজ্য তোমার,
ক্ষুদ্র নররাজ্য তার কাছে কোন ছার॥

কৃষ্ণ—যতদিন খণ্ডরাজ্য রহিবে ভারতে, আর্য
জাতি খণ্ড-খণ্ড, পার্থ, রহিবে নিশ্চয়;
রহিবে এ রাজ্যভেদে ধর্ম ভেদময়।

ফল ফুল ভিন্ন যথা তরু ভিন্ন হবে তথা,
প্রকৃতির এই নীতি,—ক্ষুদ্র ভিন্নতায়
করে ধর্ম-বিভিন্নতা যথায় তথায়।

এক ধর্ম, এক জাতি একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য, নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ডদেহ হবে না মিলিত।

ততদিন হিংসানল হায়, এই হলাহল
নিবিবে না। আত্মঘাতী হইবে ভারত,
আর্যজাতি, আর্যনাম, হবে স্বপ্নবৎ।

ধর্মভিত্তি নাহি যার, বালিতে নির্মাণ তার,
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ, নিজ পাপভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙ্গি কাল—পারাবারে।

তেমতি, হে মহাবল সমাজ সাম্রাজ্য-বল
নাহি যে ধর্মের, তার হবে না প্রচার,
নহে সত্ত্ব-গুণমাত্রে সৃজিত সংসার।

পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম, তুমি কি তাহার মর্ম
বুঝিয়াছ, করিয়াছ সে ধর্ম গ্রহণ?
অর্জুন—করিয়াছি,—লইয়াছি চরণে শরণ।

কৃষ্ণ—দেখ তবে, মহারথ তোমার কর্তব্যপথ,
জননীর ওই চিত্রে অঙ্কিত সুন্দর,
ততোধিক নর-ব্রত নাহি মহত্তর।

এস মিলি দুইজন করি আত্মসমর্পণ
এই কর্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ—পদে সমর্পিয়া।

এক ধর্ম এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ম্, করিব নিশ্চিত
ওই ধর্মরাজ্য মহাভারতে স্থাপিত।

বৈশাখ

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল,
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল!
স্বামী তার "চৈত্রমাস," অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জানু করি নত,
কার তপ ভাঙ্গিবারে করিছে প্রয়াস?
রুদ্রের মুরতি ওযে!—একি সর্বনাশ!

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে!
সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখি প্লক্ষতরুতলে,
তপে মগ্ন,—চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে?
হে চৈত্র, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা! নাশিতে জীবন,
রোষান্ধ বৈশাখ ওই, মেলিল নয়ন!

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে "কি কর কি কর,"—
নব উষা বলে—"ক্রোধ সম্বর, সম্বর!"
কোকিল ডাকিল মুহু, করিয়া মিনতি;
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি!
বৃথা! বৃথা! বৈশাখের দু চক্ষু হইতে,
নিঃসরিল অগ্নিশিখা বেগে আচম্বিতে!

ভস্ম হ'ল চৈত্র মাস! হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দুর বিন্দু, বাসন্তী যামিনী!
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া!
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া!
প্রজাপতি লুকাইল করবীর ভিড়ে,
ভিজিল শিরীষ-পুষ্প নয়নের নীরে!

লতিকা পড়িল লুটি তরুর চরণে;
বনস্থলী পতিহীনা নবীন যৌবনে!
দিন বলে "এবে আমি খেটে হব সারা,"
রাত্রি বলে "হায় আমি এবে আয়ু হারা।"

চিরযৌবনা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

আমার প্রতিভা আজি কাঙ্গালিনী, হে শ্যাম সুন্দর!
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর। মাধবী-মন্ডপ তার মধুপে মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত! শুষ্ক সরোবর;
ফোটেনা, ফোটেনা তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার! ঝরি গেছে লতা-পাতা; ওই দীনস্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে (হায় তারে কে করে আদর?)—
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে!
হে বঁধু হে প্রাণেশ্বর! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ!
তুমি যবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভূষণে?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলু থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি তারে করিবে না ঘৃণা,—
পতি চক্ষে, প্রাণনাথ, প্রবীণা যে সুচির-নবীনা!

উষার শিশির

গোবিন্দচন্দ্র দাস

শরতের সোনা ঊষা ঘুম ভেঙে চায়,
জগৎ ভিজিয়া আছে শিশিরের জলে।
সুন্দর সবুজ মাঠ কিবা শোভা পায়,
সাদা পুঁতি গাঁথা যেন শ্যামল আঁচলে।
ঝোপে ঝাপে পাতা আছে মাকড়ের জাল
তাহাতেও হিমকণা পড়িয়াছে কত।
মনে হয় বুঝি কেহ না'হতে সকাল
জাল ফেলে তুলিয়াছে মোতি শতশত।
বাগানে চাহিয়া দেখ কত ফোটাফুল
তার গায় শোভা পায় নিশির নীহার
রজনী চলিয়া গেছে তাই শোকাকুল—
আঁখিনীরে ভাসে মুখ ফুল-বালিকার।
সত্যই স্নেহের অশ্রু এত মনোহর
চুম্বনে শুষিছে ঊষা করিয়া আদর।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিরবিদায়ে

গোবিন্দচন্দ্র দাস

যাবে তুমি? এ জগতে কে না বল যায়?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায়?
বসন্ত বাঁচিয়া থাক্ নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায়!
বারমাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক্ অমা-রাহু ক্ষতি নাহি তায়।
তুমি থাক মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু কণিকায়?
আমরা পথের ধূলি, কর্দম কঙ্করগুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায়!

বিধির অপূর্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কোহিনূর কিরীট চূড়ায়!
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায়!

গভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে,
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন!
পাতিয়া অঞ্চল-ঢেউ, আঁধারে দেখিনি কেউ,—
মহাযত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ!
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন!
কত যুগ-যুগান্তর, হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুটিয়া নিল করিয়া মন্থন,
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়া পাইবে তাই,
লবণাক্ত ফেনে হবে সুধার সৃজন।
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতির গর্ভে হবে মুকুতা গঠন।
সত্যই কবি কি মরে? বোঝেনা অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ!

চির আকাংক্ষিত

গিরীন্দ্র আহিনী

তুমি থাক আকাংক্ষা আমার
শিশু যেন করে সাধ নিত্য সে সুন্দর চাঁদ,
মিটেনাক বাসনা তাহার।
তুমি থাক তেমতি আমার।

তব লাগি উথলিয়া নিয়ত উঠুক হিয়া
চির দিন শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
চাহিনাক মিলনের দিন।
আধফোটা পদ্মফুল বৃন্তপরে দুলদুল
তরঙ্গের রঙ্গে অনিবার।
তুমি থাক তেমতি আমার।

আমি তোমা ঘিরে ঘিরে বেড়াইব ঘুরে ফিরে
মধুর গুঞ্জনে ভরি দিব চারিধার।
তুমি থাক আকাংক্ষা আমার
তুমি মোর হয়োনা পাবার।

তাহে নিতি নবসুর উঠিবে না সুমধুর
বাজিবেনা সারঙ্ আমার।
বেড়ি বেড়ি বিকর্তন ঘোরে যথা গ্রহগণ
ঘুরুক সহস্র সাধ তব চারিধার।

তুমি মোর হয়োনা পাবার।
সংকীর্ণ তৃপ্তির মাঝে তোমার কি বাস সাজে?
অতৃপ্ত অনন্তভূমে রাজত্ব তোমার।
দূর থেকে সমর্পিব কর অনিবার,—
তুমি থাক আকাংক্ষা আমার।

শৃঙ্খলমুক্ত

অক্ষয়কুমার বড়াল

আর কেন বাঁধি তারে—শিকল দিলাম খুলি'।
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি,'
ঝাপটি' পড়িল ভুমে, ভয়ে কাঁপে পাখা দুটি;
পুত্র কন্যা দেয় তাড়া—করে ঘরে ছুটাছুটি।

ল'য়ে গেনু গৃহ-শিরে অতি সন্তর্পণে ধরি,'
সর্বাঙ্গে বুলানু কর কত না আদর করি';
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন কূজনে গুঞ্জনে গানে।

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়া—
উড়িছে হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণ-রৌদ্র আলোড়িয়া।
কি আলোক, পরিপূর্ণ! কি বায়ু পাগল-করা!
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

ধায় ছাড়ি' গ্রাম, নদী; দূরে মাঠে যায় দেখা
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ শ্যামল বঙ্কিম রেখা।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধরা অবিরত—
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত।

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাহি আর!
চকিতে ভাতিল মেঘ অমরার সিংহদ্বার!
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারা মণি!

এই মৃত্যু—এই মুক্তি! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী!
আমিও ত বন্ধজীব, আমিও ত মুক্তিকামী!
আমিও কি ফেলি' দেহ—বিস্ময়ে আতঙ্ক-হীন—
অসীম সৌন্দর্যে তব হইব আনন্দে লীন?

জিজ্ঞাসা

অক্ষয়কুমার বড়াল

গৃহচূড়ে উঠে নর সোপান বাহিয়া,—উঠে ধীরে ধীরে।
এজগতে নিরন্তর বাহি শোক দুঃখস্তর
উঠে কি মানব আত্মা তোমার মন্দিরে?

পদে পদে পরাজয় অতি অসহায়—অদৃষ্ট নির্ম্মম
এই অশ্রু এই শ্বাস করে কি জড়তানাশ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম?

এই যে পশুর মতো সতত অস্থির—প্রকৃতি তাড়নে
এ মোহ কলঙ্ক লিখা তোমারি কি হোমশিখা
দহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে?

এই দর্প অহঙ্কার কুচক্র কুআশা—একি আরাধনা?
এই কাম এই ক্রোধ দিতেছে কি আত্মবোধ?
লোভে ক্ষোভে হতেছে কি তোমার ধারণা?

জগৎ ভিতর দিয়া জগতের জীব বুঝে কি তোমায়?
এই পড়ে এই উঠে এই হাহাকারে ছুটে
পাপে অনুতাপে লভে দেব মহিমায়?

প্রবীণ জনক যথা শিশুক্রীড়া হেরি হাসিয়া আকুল
অমনি কি দেহশেষে আমিও উঠিব হেসে
স্মরি নরজনমের সুখ দুঃখ ভুল?

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ?—কহ দয়াময়!
উঠিয়া পর্ব্বতচূড়ে হেরি ধরাতলে দূরে
পথের তো দুঃখ ক্লেশ ভ্রম মনে হয়।

ফাঁকি

রবীন্দ্রনাথ

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি নানা মাপের কৌটা হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, "হাওয়া বদল করো।"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি॥

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে-আবডালে
মোদের হ'ত দেখাশুনা ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিল ছাড়া-ছাড়া,
চাপা-হাসি টুকরো-কথার নানান্ জোড়া তাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশ ভরা সকল আলো ধ'রে
বরবধূরে নিলে বরণ করে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হ'ল নতুন লোকে॥

রেল লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপ্নারই ভার বইবে কেমন ক'রে।
সংসারের ওই ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারে বার,
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার,

কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সামনে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে—
সেই কথাটা মনে করে পুলক দিল গায়ে॥

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ-ঘন্টা কাল থামতে হবে যাত্রিশালায়;
মনে হল, এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, "কেন, এই তো বেশ।"
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রি-শালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,
"দেখো দেখো, এক্কাগাড়ি কেমন চলে।

আর দেখেছ?—বাছুরটি ওই, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসু গাছের তলাটিতে পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট-বাড়ি
ওই-যে রেলের কাছে—
ইস্টেশনের বাবু থাকে? আহা, ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রী ঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে;
বলে দিলেম, "বিনু এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।"
প্লাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার—
ঘন্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, "কথা একটা আছে।"

ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।

বিনু বললে, "রুক্‌মিনি ওর নাম।
ওই-যে হোথায় কুয়োর ধারে সারবাঁধা ঘরগুলি
ওইখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরো-শো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল; স্বামী স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।

সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে"—
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
"রুক্‌মিনির এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।
আমার মতে একটু যদি সংক্ষেপেতে সার'
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।"
বাঁকিয়ে ভুরু পাকিয়ে চক্ষু বিনু বললে খেপে,
"কক্‌খনো না, বলব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাব্‌না কিসের তবে।
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।"
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে,
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল সেইটে কিছু দামি।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই।
অনেক টেনেটুনে তবু পাঁচিশ টাকা খরচ হবে তারই,
সে ভাব্‌নাটা ভারি
রুক্‌মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার পরে ভার
কুলিনারীর ভাব্‌না ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পাঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে॥

অবাক কাণ্ড একি।
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি।

জাতে হয়তো মেথর হবে কিম্বা নেহাত ওঁচা,
যাত্রী ঘরের করে ঝাড়া মোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে!
এমন হলে দেউলে হতে কদিন বাকি থাকে?
"আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। আমি দেখছি, মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই।"
বিনু বললে, "এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে—
আচ্ছা ক'রেই দিলেম তারে হে'কে,
"কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি!
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি!"
কে'দে যখন পড়ল পায়ে ধ'রে
দু'টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় ক'রে॥

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দুমাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সি'থির প'রে নিত্যসি'দুর-সম
এই দুটি-মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি,
সেই দুমাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি—
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্মিনিরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা,

বিন্দু যে সেই দুমাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে—
জানল না তো ফাঁকি সুদ্ধ দিলেম তারই হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে,
"রুক্‌মিনি সে কোথায় আছে?"
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে—
রুক্‌মিনিকে তাই বা কজন জানে।
অনেক ভেবে 'ঝামরু কুলির বউ' বললেম যেই
বললে সবে,"এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি "কোথায় পাব তাকে।"
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন,"সে খবর কে রাখে?"
টিকিটবাবু বলেন হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিম্বা খসরুবাগে,
কিম্বা আরাকানে।"
শুধাই যত "ঠিকানা তার কেউ কি জানে!"
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ।
কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো, আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন,
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে"
বিন্দুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলেম দায়ী,
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী॥

তপোভঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ

যৌবনবেদনারসে-উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুক মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?
একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি?
দস্যু তারা হেসে হেসে হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা-বাঁশরি;
গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য-রভসে॥

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যান মন্ত্রটিরে আনিল বাহির-তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা॥

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হ'ল অবসান;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য তব উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হ'ল আপনাতে আপন বিস্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,

আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার॥

সেদিন উন্মত্ত তুমি যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে।
ললাটের চন্দ্রালোকে নন্দনের স্বপ্ন চোখে
নিত্য নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা—
রূপ-তরঙ্গিমা॥

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখালতা
রক্তিম অঙ্কনে?
অগীত সংগীতধার অশ্রুর সঞ্চয়ভার,
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।
তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি॥

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমাব জটায়-হারা গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
"নাহি রে, নাহি রে॥"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে;
দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।

নির্জন প্রান্তরতলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে॥

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রভাবে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের-শাসন-নাশন
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন—
তারি সম্ভাষণ॥

তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী;
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি॥

হে শুষ্কবল্কলধারী বৈরাগি, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম রণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে॥

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে;
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্ত দুঃখদাহে।
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি॥

আমারে চেনেনা তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী—
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খল খল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক' বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে॥

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবী বল্লরী মূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু,—চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরানে॥

স্বর্গ হইতে বিদায়

রবীন্দ্রনাথ

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা
মলিন ললাটে;—পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
হে দেব হে দেবীগণ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মত
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল! শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে;—অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হ'তে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হ'ত মর্তের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে;—নন্দনকানন
মর্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি,' মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি দিবা অবসানে
নির্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী, নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য-সংগীত
নক্ষত্র সভায়! মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে

তালভঙ্গ হ'ত! হেলি' ঊর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা! দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে! পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি! ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি' আনিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস, খসি' ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী!—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী! মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু'দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু'দণ্ডের তরে!
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি, ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্তে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!

হে অপ্সরি,

তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক্ ম্লান—লইনু বিদায়;
তুমি কারে কর না প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক! ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে

অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভান্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে
চন্দনচর্চিতভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখ সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে! দেবগণ
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম—যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি শরমের;—মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি! আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠিছে মোর চিত্ত তোর তরে
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পুরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি! তব নীলাকাশ, তব আলো,

তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা,—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।
হে জননী পুত্রহারা
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি' পড়ি' তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে; তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ—স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিত সম;—
তার পর দিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান্ প্রাণে
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই—
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই!

ভাষা ও ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ

যে দিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র, অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীর-তরু করিয়া উন্মূল,
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল,
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়; সেই মত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে,
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তারে লয়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ,—
তরুণ গরুড়সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট্ নীড়?—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,—
তার নিত্য জাগরণ! অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ!

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি 'পরে।
নমস্কার করি কবি, শুধাইলা সঁপিয়া আসন,—
"কি মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্তে আগমন?"
নারদ কহিলা হাসি,—"করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি'

আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এস,—বোলো তারে, 'ওগো ভাগ্যবান্!
এ মহা-সঙ্গীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্তলোকে দিবে অমরতা?'"

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,—
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি'
কি কহিছে, স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষশাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জন-গান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হ'তে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে
সঙ্গীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু-পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি' একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্তগগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা—বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ—
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তকে করি উদ্ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ, সকল প্রয়াস,
জীবলোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা—অনির্বাণ অনলের কণা—
জ্যোতিষ্কের সূচিপত্রে আপনার করিছে সূচনা

নিত্যকাল মহাকাশে; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গম পল্লব-দুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান;—সেই মত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস?
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ,
যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্বপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থনে।
মহাম্বুধি যেই মত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে,
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক্ হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।

"হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হ'তে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষ বিরাজে
কহ মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে ল'য়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।”
নারদ কহিলা ধীরে, “অযোধ্যার রঘুপতি রাম!”

“জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা,”
কহিলা বাল্মীকি, “তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে!”
নারদ কহিলা হাসি,' “সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো!”
এত বলি' দেবদূত মিলাইল দিব্য-স্বপন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

পৃথিবী

রবীন্দ্রনাথ

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে
মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্য,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে॥
তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল কলাকৌশলবর্জিত;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের' পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা॥

দেবতা এলেন পরযুগে,
মন্ত্র পড়লেন দানব-দমনের—
জড়ের ঔদ্ধত্য হ'ল অভিভূত;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।

উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখর চূড়ায়,
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট॥
নম্র হল শিকলে বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস,
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা—
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠেছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে—
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে॥
শুভে-অশুভে-স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়।
আমিও রেখে যাব কয়-মুষ্টি ধূলি,
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে॥

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্ক-ধান্য-ভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—

সেখানে প্রসন্ন প্রভাত সূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
"আমি আনন্দিত।"
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎ চঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়;
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ;
তার লেজের ঝাপটে ডাল পালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।
আবার ফাল্গুনে দেখেছি, তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগত প্রলাপ
আম্র মুকুলের গন্ধে;
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে॥

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য নবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যূষে;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে॥

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ড কালের ছোট ছোট পিঞ্জরে;
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান॥

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে;
এত দিন যে দিনরাত্রির-মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোন একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি;
জীবনের কোনো একটি ফলবান্ খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে॥

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

প্রথম পরিচয়

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?
গেছি ভুলে, এখন খালি চিরদিনের মনে হয়।
মেঘের তড়িৎ বনের হরিৎ, সিন্ধু সরিৎ মাঝে কি?
উজল নিশায় বিমল ঊষায় দিবায় কিংবা সাঁঝে কি?
স্তব্ধ তারা কয় না কথা তবে সেথায় নয়রে নয়।

সে কি ধ্যানে? সে কি জ্ঞানে? সে কি গভীর সাধনায়?
সে কি সুখের ফুল্ল বুকে সে কি দুখের যাতনায়?
কহে তারা নিজের কথাই; তবে সেথায় নয় রে নয়।

কবে কোথায় পরের ব্যথায় আকুল হ'য়ে কেঁদেছি,
মন ভুলায়ে হাত বুলায়ে কোথায় কাকে সেধেছি,
সেথায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিলে প্রেমময়।

পান্থ

বিজয়চন্দ্র

রাস্তা হেঁটে আমি পথিক, আধ শতাব্দীর চেয়েও অধিক,
দেখছি এসে অবশেষে সাথের সাথী যারা
চলে গেছে পাশ কাটিয়ে, সিন্ধু পথে পাল্ খাটিয়ে,
কিংবা ঊর্ধ্বে পুষ্পরথে এড়িয়ে দেহ-কারা।

একলা এখন বস্‌ছি জুড়ে পান্থশালার ভাঙ্গা কুঁড়ে,
ধু ধু কচ্ছে দূরে দূরে সাগর কূলের বালি।
মাথার উপর কুঁড়ের চালে পথের ধারে শুক্‌নো ডালে
কাক ডাকিছে রুক্ষ স্বরে দুঃখ ঢেলে খালি।

মনের ভুলে যখন খুলি তালি দেওয়া স্মৃতির ঝুলি,
হাত্‌ড়ে খুঁজে প্রাচীন সুখের মালা জড়াই গলে;
নেড়ে চেড়ে দেখে খানিক স্নেহপ্রীতির রত্নমাণিক,
ফস্‌কা গেরো এঁটে আবার জড়িয়ে রাখি থলে।

দিনের শেষের ছায়ার তলে সন্ধ্যা দীপে দীঘির জলে;
চাঁদের আলো মেঘের মাঝে আঁখি ঢাকে আজি!
কোথা সঙ্গী, কোথা সখা? করুণ সুরে কাঁদে চকা!
পর পারের পানে চেয়ে একলা বসে আছি!

দূরের পথে এযে রাত্রি! আর কত দূর যাবি যাত্রী?
ঐ কে বলে চির দীপ্ত পর-পারের ধরা?
আলো নয় আলেয়ার খেলা, ধাঁধায় কাটে আঁধার বেলা;
জীবন তারই স্মৃতি-ঘেরা স্বপ্ন দিয়ে গড়া!

হাসি ও অশ্রু

দ্বিজেন্দ্রলাল

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে' অর্ধ জীবন করেছিতো অপচয়!
চলে' যারে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়!
গলা ধ'রে কাঁদ্‌তে শিখি গভীর সহবেদনায়;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ!

নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দয়মন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার,
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বান্ত—নিয়ে আয় সেই অশ্রুলোক।
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন-বিপক্ষেতে সারিবন্ধ ইয়োরোপ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরঙ্গীবের মৃত্যুভয়,
পানিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয়;
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহে' যাক।
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতটি ধরে' আমায় সেথায় নিয়ে চল্।

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদ্‌তে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্মের জন্য দেহপাত ও ধর্মের জন্য জীবনদান!
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ,
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আত্মরক্ষা দৃঢ়পণ;
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পবের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচিব সেই অস্থি দান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস,—
সেই রাজ্যে নিয়ে যা'রে কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে,
শেষে প্রাণের উজানটানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে দে।

সুখ-মৃত্যু

দ্বিজেন্দ্রলাল

মরিবার ইচ্ছা নাহি, সত্য, না মরিতে চাহি;
তথাপি মরিতে হবে—সৃষ্টির নিয়ম!
জন্মিলে মরিতে হয়, তবে কেন এই ভয়?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা?—ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম!

মরিয়াছে পিতৃগণ; মরিয়াছে সর্বজন—
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা, মহৎ;
আমি কি সামান্য তুচ্ছ?— গেল দেশ কত উচ্চ—
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত!

কালের প্রবাহে, কত জল-বুদ্‌বুদের মত,
উঠি নব জীব জাতি অদ্য অধোগামী!
এ পৃথিবী লুপ্ত হবে; ওই সূর্য গুপ্ত হবে;
আমার মরিতে ভয়—তুচ্ছ জীব আমি!

তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া, পুত্র-কন্যাগণ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন।

খুলে দিও দ্বার!—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এত দিন যাহাদেরে বাসিয়াছি ভালো।

আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে চামেলি-গন্ধ,
একবার বসন্তের পিকবর গাহে,
হয় যদি জ্যোৎস্না-রাত্রি— আমি ও-পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে!

গঙ্গা

দ্বিজেন্দ্রলাল

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।
শ্যামবিটপিঘন-তট-বিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি'
করি' সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।

নারদকীর্তন পুলকিত মাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটিজটিলজটা' পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগরসঙ্গে।

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথী! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে।

ধরায় দেবতা চাহি

কামিনী রায়

ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে ধরায় দেবতা চাহি গো চাহি,
মানব সবাই নহে গো মানব,
কেহ বা দৈত্য, কেহ বা দানব,
উৎপীড়ন করে দুর্বল নরে, তাদের তরে যে ভরসা নাহি—
ধরায় দেবের প্রতিষ্ঠা চাহি।

সেকালে দেবতা গোলোক তেয়াগি, মাটীর ধরায় মরের গেহে,
লইত জনম নর-শিশুরূপে; বাড়িয়া উঠিত নারীর স্নেহে;
ধূলা বালু লয়ে খেলিয়া বেড়াত আর দশজন শিশুর মত;—
আসিলে সময় দৈব বলে বলী,
দানবে দলিতে যাইত সে চলি,
হেলায় সংহারি দুরাচারগণে,
নিরাতঙ্ক করি সাধু সজ্জনে,
ফিরিয়া আসিত অপরাহত।

ত্রিদিব তেয়াগি আসে কি না আসে, নরের আলয়ে নারীর কোলে,
আজিও দেবতা নর-জন্ম লয়,
ধরণীর গ্লানি, ম্লানি করি ক্ষয়,
আলোকের দিকে টানিয়া তোলে।
ঐশ্বর্য আরাম চাহে ভুলাইতে, স্নেহ প্রেম কত বাঁধিতে চায়,
মাতা কাঁদে, জায়া শিশু দেয় কোলে, সকল বাঁধন কাটিয়া যায়।

বাহিরে বাতাসে যেই আর্তনাদ, যে রোদন ধ্বনি বহিয়া যায়,
শুনিতে শুনিতে অভ্যাসবশে সকলে যাহা না শুনিতে পায়—
তাই ডেকে লয় নর-দেবতায় সংগ্রামে পশিতে দানব সাথে,
দানব-সংহার মানবেরি কাজ, দধীচির হাড় ইন্দ্রের হাতে
বজ্র হয়ে আছে, রবে চিরদিন, মানবেরে দিয়া দেবের জয়;
ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে ধরায় দেবতা নহিলে নয়।

এরা যদি জানে

কামিনী রায়

এদেরওত গড়েছেন নিজে ভগবান্,
নররূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে
বিঁধে শল্য সম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ এরা মায়ের সন্তান।

এরা যদি আপনারে শিখে সম্মানিতে,
এরা দেশ-ভক্তরূপে জন্মভূমি-হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম বাক্য নহে—দিবে কর্ম;
আলস্য বিলাস আজো ইহাদের চিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে।

এরা হতে পারে দ্বিজ—যদি এরা জানে,
মিথ্যা ভয়ে সরি' এরা রহে ব্যবধানে?
এরা হতে পারে বীর, এরা দিতে পারে শির
জননীর, ভগিনীর, পত্নীর সম্মানে;
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে।

উচ্চ কুলে জন্ম বলে' কত দিন আর
ভ্রান্ত মোহে রবে এই বৃথা অহঙ্কার?
কৃতান্ত সে কুলীনের রাখে না তো মান,
তার কাছে দ্বিজ শূদ্র পারীয়া সমান।
তার স্পর্শে যেই দিন পঞ্চভূতে দেহ লীন
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে রহে কত ব্যবধান?

কান্তগীতি

রজনীকান্ত

(১)

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে;
কী পিপাসা ল'য়ে বুকে, পলে পলে মুক্তি যাচে।
কী সে অবারিতটানে, নদী ছোটে সিন্ধু পানে,
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে?
প্রভাতে যখন পাখী, নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর কানন মাঝে,
দুর্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে;
কী তীব্র উৎকণ্ঠা ল'য়ে, আশার আশ্বাসে বাঁচে!

সে ব্যাকুল টান কোথায় পাব, তেমনি ক'রে মাকে চাব,
সুখ দুঃখ ভু'লে যাব, হায়রে, সে দিন কোথা আছে!
হ'য়ে অন্ধ, হ'য়ে বধির, "মা," "মা" ব'লে হব অধীর,
দুনয়নে বইবে রে নীর, দীন হীন কাঙালের সাজে।

(২)

তব চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত-হরষে, সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্যগরিমা কীর্তিকাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।

(৩)

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি;
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল!
উদ্বেলিত সিন্ধুতরঙ্গ উত্তাল
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল;
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে, তুমি নিরমল!
পুষ্প কহে, তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে, মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে, অনন্ত অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল!

নদী কহে তুমি, তৃষ্ণা-নিবারণ,
বায়ু কহে, তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে, শান্তি নিকেতন,
প্রভাত কহিছে, সুন্দর উজ্জ্বল।
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান,
ভক্ত কহে, তুমি আনন্দনিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্য পান
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল।

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ

মানকুমারী

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বালাই! বালাই!
হৃদয় চমকি ওঠে শোণিতে আগুন ছোটে,
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় ছাই!
এ দীন পতিত দেশে পতিতপাবন-বেশে—
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই!
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে বুক ফাটে তাই।

আহা যদি 'পিতৃশ্রাদ্ধ' সারা বঙ্গময়—
'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, দেখিব তাহারি কর্ম',
হৃদি-পিণ্ডে পিণ্ডদান করো সমুদয়;
পদধূলি রাখি শিরে, চল যাই গঙ্গা-তীরে,
ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্যুদয়—
এ যে গো প্রতিষ্ঠা—এতো বিসর্জন নয়।

বিষাদের দিনে এই নব মহোৎসব,
দিয়া ভক্তি উপহার—'ষোড়শ' সাজাও তাঁর!
কোটি ভাই বোন কেউ থেকনা নীরব;
কি করিবে 'বৃষোৎসর্গ' এ বিধি যে 'আত্মোৎসর্গ'
ফিরে যাহে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটি শব!

খুলিয়া বুকের পাতা দেখ সঞ্জীবনী গাথা,
পড় সে 'বিরাট পুঁথি' বীরত্বের স্তব!
আজি পিতৃপ্রীতি লাগি হও সবে স্বার্থত্যাগী,
উঠুক দিগন্ত ভেদি কোটি কণ্ঠ-রব,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ—নব মহোৎসব!

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে আত্মা দাও ডালি—
কাঙগালী 'বিদায়' যাচে, দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে ভারত কাঙ্গালী!
টাকা পয়সার তরে আসেনি সে, শোকভরে—
কাঁদিছে সে, কোল তার হয়ে গেছে খালি,
দাও মারে দাও ভিক্ষা, মহামন্ত্রে লও দীক্ষা,
'ঈশ্বরের' ভাই হও ছ'কোটি বাঙগালী!
জননী হয়েছে আজি 'ঈশ্বর—কাঙগালী'!

'বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ', বড় গালাগালি—
ক'স্‌নে ও কথা ফিরে কোটি বুক যায় চিরে,
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় কালি!
জাতীয় ঐ পিতৃকৃত্য তবেই তো হবে 'নিত্য.'
হীনতা নীচতা দাও গঙগা জলে ঢালি!
শেখ সে উদ্যম-আশা বুকভরা ভালবাসা,
পুরাও পরাণ দিয়ে মার কোল খালি!
মহাশ্রাদ্ধ হোক্‌ শেষ, 'ঈশ্বরে' ভরুক দেশ,
পুজিব সে পিতৃ-মূর্তি হৃদয়ে উজালি,
নিতি দিব—তৃর্পণের আঁখিজল ঢালি!

তাজমহল

প্রমথ চৌধুরী

সাজাহাঁর শুভকীর্তি, অটল সুন্দর
অক্ষুণ্ণ অজর দেহ মর্ম্মরে রচিত;
নীলা, পান্না, পোখরাজ অন্তরে খচিত।
তুমি হাস, কোথা আজ দারা সেকন্দর?
সকলি সদর তব, নাহিক অন্দর,
ব্যক্ত রূপ স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।
প্রেমের রহস্যে কিন্তু একান্ত বঞ্চিত;
ছায়ামায়াশূন্য তব হৃদয়-কন্দর!
মুমতাজ! তাজ নহে, বেদনার মূর্তি।
শিল্প-সৃষ্টি-আনন্দের অকুণ্ঠিত স্ফূর্তি।.
আঁখিতে সুর্মা-রেখা, অধরে তাম্বূল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জড়িতে জড়িত বেণী, রুমালে স্তাম্বুল,—
বাদ্‌শার ছিলে তুমি খেলার পুতুল॥

চেরি-পুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্বতের স্তরে স্তবে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী ঊষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছ ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছ ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্ত ভেরী!
মর্ম্মর-কঠিন-শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব দরশনে।

অন্তিমে

চিত্তরঞ্জন

নিভিয়া গিয়াছে হাসি, শুকায়ে এসেছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি, মৃত্যুর এ কিরে ভুল!
যৌবন চলিয়া গেছে, স্বপন গিয়াছে তার,
চরাচরে ছেয়ে গেছে, পরাণের অন্ধকার!
বঁধু নাই—বাঁশী নাই—বৃন্দাবন? তা'ও নাই,
অন্তরের সাধগুলি, পুড়িয়া হয়েছে ছাই!
আজ শুধু মধু-স্মৃতি শ্মশানে কুসুমসম,
পুরাতন জীর্ণ গৃহে, মলিন প্রদীপ মম।
মৃত-রবি-কর-রেখা,—শুষ্ক ফুল সঙ্গে তার,
জীবন ভরিয়া মোর; কাঁদে অন্ধ হাহাকার।
শুকায় শুকা'ক ফুল, থেমে যায়, যা'ক্ হাসি,
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে, হৃদয় যাইবে ভাসি।
চাহি না শুনিতে আশে বসন্তের পুষ্পরাণী,
ঢে'ল না শ্রবণে মোর বীণা-বিনিন্দিত বাণী।
জেবল না জীবনে আর তোমার সোণার বাতি
আছে প্রাণে, থাক্ থাক্ আমার আঁধার রাতি।
শতচ্ছিন্ন ছিদ্র-বস্ত্র পরিধানে আছে যা'র
কনক আলোক রেখা, লজ্জার কারণ তার।
ভাসিয়া গিয়াছে স্বপ্ন ভুলিয়া যেতেছি গান
সাজে না জীবনে আর বসন্ত-ব্যাকুল তান।
সকলি হারায়ে গেছে, জীবন দিয়াছি ছেড়ে—
আঁধার হৃদয় মাঝে, আঁধার গিয়াছে বেড়ে।
নিভিয়া এসেছে হাসি শুকায়ে এসেছে ফুল
বিধাতার এ কি লীলা,—মৃত্যুর এ কি রে ভুল।

মেঘের দল

অতুলপ্রসাদ

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
—ও আকাশ বল্ আমারে।
কেউ বা রঙীন ওড়্না গায়ে, কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে।

তারা কোন্ যমুনার নীরে ভর্বে গাগরী,
কার বাঁশরী শুন্লে এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি!
তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর, যায় চ'লে কার উদ্দেশে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।

কভু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,
কভু ভানুর সনে খেলে হোলি, প্রভাতে সাঁঝে, মরি মরি!
তারা বিধুর সনে কি কথা কয় উজল মধুর হেসে!
—ও আকাশ বল্ আমারে।

আকাশ বল্রে আমায় বল্, আমার আঁখি-জল
তাদের মত জীবনখানি কর্বে কি শ্যামল—আমায় বল্ রে।
(আমি তাদের মত) আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা,
খেল্ব কি দিনের শেষে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।

মাতৃহৃদয়

প্রিয়ংবদা দেবী

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রি। জীবধাত্রি! নিত্য দিবা যামী
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি; নিয়ত ক্রন্দন
তারি স্পর্শহারা হয়ে, করি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন মাঝে, শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্য মন্ত্র,—যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ বেদনা
কোটি সন্তানেরে তবু প্রশান্ত-বেদনা।
তবু ফুটাতেছ ফুল। জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক ভূলোক।

ব্যর্থ-চেষ্টা

প্রিয়ংবদা

শুধু চতুর্দশ পদে বাখানিতে চাই
যে প্রেমের অন্ত নাই নাহি যার শেষ,
প্রতি ছত্রে, প্রতি পদে তাই বাধা পাই
তাই কবিতার মোর হেন দীন বেশ।
এ যেন মুকুর তলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,
নিত্য নব রূপময়ী প্রকৃতির মায়া
গড়িয়া রাখিতে চাই মর্ম্মের আকারে।
সব পড়েনা'ক চোখে কত থেকে যায়,
চঞ্চল-জীবন-লীলা নাহি দেয় ধরা,
হাসিটি ফুটিলে, অশ্রু ফোটে না'ক হায়,
হেরি যদি নভস্থল, শ্যাম বসুন্ধরা
পড়ে থাকে বহুদূরে, নির্ঝর নিক্কণে—
সমুদ্রের বজ্রনাদ জাগে না স্মরণে।

জীবন-মাধুরী

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ধন্য হয় মানবের ঐহিক-জীবন, জাগে যবে বিশ্বরঙ্গ-মাঝে,
চৌদিকে অপার সিন্ধু থাকে তরঙ্গিতে, তার মাঝে ধায় শত কাজে!
অনন্ত-কল্যাণময় লোকহিতব্রত মহাগর্বে বহি' চলে শিরে,
পদে পদে বাধা আসি' করে পরাহত, আত্ম-বলে সে যে উঠে ফিরে!
সাথে থাকি জ্বলে নিত্য সুকৃতি সম্বল অন্ধকারে মাণিকের মত,
একটি অতুল রত্ন, অমল উজ্জ্বল চারি দিকে দৈন্য শত শত!
বেড়ে যায় পুণ্যবল, ঘৃণা হয় পাপে, ক্ষুদ্র সুখ করে পলায়ন,
গভীর গম্ভীর শান্তি সকল সন্তাপে পাতি দেয় সুস্নিগ্ধ শয়ন।
চঞ্চলা সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বাঁধা র'ন পাশে, চিরদিন প্রেয়সীর প্রায়,
সিদ্ধি যত হ'তে থাকে, সাধ তত আসে নব নব বিপুল আশায়।
স্বর্গ হ'তে নামে জ্যোতি, মানস আসনে বিরাজেন কমল-আসীনা!
ভক্ত-হস্তে দেন তুলি' আপনি যতনে অনাদৃত গীতহীন বীণা।
যত কিছু ফোটে তাহে মূর্ত মহিমায়, অমর অপূর্ব ধ্বনি সব,
সুমেরু-শিখর-চূড়ে উঠিবারে চায় মহোৎসাহে মর্ত্যের মানব!

আমি

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

দুইটি বিরোধী "আমি"র নিবাস দেহের ভিতরে মোর,
তোমারি কারণে দুঁহু দোঁহা সনে সতত কলহে ভোর।
এক আমি সদা তোমা ভুলি' গলে জড়ায় মায়ার পাশ,—
আর আমি চায় লুটিতে ও পায় টুটিয়া করম-ফাঁশ।
রোষে, অভিমানে, ক্ষুব্ধ পরাণে এক আমি রহে দূরে,—
মান, অপমান পাশরি' অপরে তোমা লাগি' সদা ঘুরে।
বিষের আধার বিষয়-বিকার একে করে জর্জর,
তব প্রেম-সুধা অপরের ক্ষুধা নিবারে নিরন্তর।
আধেক আমার তোমার মাঝার মিশিয়া পূর্ণ হয়,—
বাকি আধা মোর তোমারে ভুলিয়া সতত ক্ষুণ্ণ রয়।
এ দুই আমার বাদ অনিবার পাগল করিল মোরে,
একেরে ছাড়িয়া অপরে লইতে পরাণ নাহিক সরে।
তুমি এ দুটিরে গড়িয়াছ নাথ! তোমারে সুধাই তাইঃ—
করুণা করিয়া পার না করিতে দুই আমি একঠাঁই?

জ্ঞান ও ভক্তি

ভূজঙ্গধর

জ্ঞান বলে এই দেহ নিতান্ত নশ্বর,
ভক্তি বলে, ভগবান্ দেহের ভিতর।
জ্ঞান বলে, মিথ্যা মায়া পুত্র পরিবার,
ভক্তি বলে, এ সংসার নিত্য লীলা তাঁর।
জ্ঞান বলে, বন্ধ-মূল কর্ম কর নাশ,
ভক্তি বলে, কৃষ্ণার্পিত কর্ম নহে পাশ।
জ্ঞান বলে, ধ্যান-যোগে শূন্য কর মন,
ভক্তি বলে, প্রেম-রসে কর নিমজ্জন।
জ্ঞান বলে, আমি সেই ব্রহ্ম অবিনাশ,
ভক্তি বলে, আমি তাঁর দাসের যে দাস।
জ্ঞান বলে, আত্ম-রতি সাধ আত্মা মনে,
ভক্তি বলে, কৃষ্ণর্পিত জীবনে মরণে।
জ্ঞান-হীন ভক্তি-হীন আমি বলি নাথ!
অন্ধজনে নিয়ে চল ধরি দুটি হাত।

খ্যাতি

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি

যেদিন আমি রইবো না আর সবার মাঝে এই ভবে,
সুখের দুখের কথা আমার সেদিন বলো কেই কবে?
রইবে না তো এমন কিছু
জাগবে স্মৃতি আমার পিছু,
লোকের আঁখি টানবে না গো আমার খ্যাতি বৈভবে।

কোনো খেদই নাইকো আমার সবই যদি যায় মুছি,
এই জীবনের সব আয়োজন মরণ সনে যায় ঘুচি;
লোকের মুখের খ্যাতিটা কি
বুঝতে আমার নাইকো বাকী
অর্থবিহীন শূন্য হাওয়ায় কোনোদিনই নাই রুচি।

মৃত্যু

রমণীমোহন ঘোষ

সুখ-দুঃখ বিজড়িত এই নর-জনমের
মৃত্যুই কি মহাপরিণাম?
যত আশা ভালবাসা অতৃপ্ত বাসনারাশি
তারি কোলে লভিবে বিরাম!

অনন্ত সাগরতীরে বালুকার খেলাঘর
যদি এই মানবজীবন,
তবে কেন তার তরে এ বিশাল বসুন্ধরা
এত শোভা করে বিকিরণ?

তবে কেন বাঁধে তারে অযাচিত স্নেহপাশে
রবি-শশি-গ্রহ-তারাগণ,
তবে কেন তার দেহে আনন্দ সঞ্চার করে
গন্ধবাহী মন্দ সমীরণ?

রজনী আসিয়া তবে কেন তারে সযতনে
কোলে তুলে লয় নিতি নিতি,
প্রভাতে তাহার কানে পীযূষ বরিষে কেন
মধুর বিহগ-কলগীতি?

কেন তবে তার চিত্তে উচ্ছ্বসিত হয় নিত্য
স্নেহ-প্রীতি-দয়া ভালবাসা?
কেন জাগে তার প্রাণে জীবন্ত কল্পনা শত,
দুর্নিবার সৌন্দর্য-পিপাসা?

কেন তার প্রিয়জন মুগ্ধহৃদে মানে তারে
যেন নিজ পরাণ-পুতলী,
বাঞ্ছিতের সুখ লাগি' কেন তবে অবহেলে
আপনার সুখ দেয় বলি?

সকলি কি মহাভ্রান্তি— ক্ষণিক স্বপন প্রায়
অর্থহীন মানবের প্রাণ,
মৃত্যুর পরশ মাত্র নিমেষে ভাঙিয়া যায়,
তারপর—অনন্ত নির্বাণ?

মৃত্যু কি স্বপনহীন অনন্ত নিবিড় নিদ্রা,
—অথবা সে মহাজাগরণ?
মৃত্যু কি নিষ্ঠুর এক মহান্ বিচ্ছেদ শুধু,
—অথবা সে অনন্তমিলন?

মৃত্যু কি অনন্ত রাত্রি চির-বিভীষিকা ভরা—
গাঢ়তম অন্ধকারময়?
অথবা, সে অবিচল দিবালোকাভাস সম
এক মহা-জ্যোতির উদয়?

মৃত্যু কি অকূল সিন্ধু, উন্মত্ত, অশান্ত, সদা
বিক্ষোভিত তরঙ্গ-সঙ্কুল,
কিংবা, চির-কুসুমিত দ্রুম লতাকুঞ্জে ঘেরা—
সুশোভন শ্যাম উপকূল?

মৃত্যু কি রাক্ষসী ক্রূর— গ্রাস করে অহর্নিশ
কোটী কোটী মানবসন্তান,
অথবা, সে নিজ ক্রোড়ে স্থান দেয় মানবেরে
স্নেহময়ী জননী সমান?

কি যে মৃত্যু, নাহি জানি, চিন্তা ক্লান্ত নরচিত্তে
চিরদিন রহস্য অপার।
কিন্তু তারে ভালবাসি; মোহিনী মূরতি তার
গড়িয়াছে কল্পনা আমার।

জানি শুধু—ভগ্ন প্রায়, শুষ্ক, শূন্য হৃদয়ের
মৃত্যু-আশা কেবল সম্বল,
সংসার-সংগ্রামাহত হতভাগ্য মানবের
এক মাত্র আশ্বাসের স্থল।

শ্রীক্ষেত্রে

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভো মহার্ণব, নীল-ভৈরব, গর্জ্জদ্-জলভঙ্গে
দূর অম্বুদ-মন্দ্র-সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা-গান?
জগৎ-জাগান' উদ্বোধনের দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

নীল-কণ্ঠের বিরাট্ পিনাক টঙ্কারে অহোরাত্র,—
আজো কি ভোলনি মন্থন-রোল,
দেব-দানবের উন্মাদ-দোল?
ইন্দিরা আজি উঠিবেন বুঝি শ্রীকরে অমৃতপাত্র!

দাঁড়ায়ে তোমার বেলা-বালুকায়, হেরি বিহ্বল চিত্তে,
যোজনান্তরে গগন-সীমায়
ঢলিয়া পড়েছ মহানীলিমায়,
তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল পন্নগ-ফণ-নৃত্যে।

হে দুর্নিবার, মুক্ত-উদার, হে পূর্ণ, অফুরন্ত,
চেয়ে' চেয়ে' ঐ বিপুল উরসে,
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে,
হেরি' নেপথ্যে অন্তবিহীন কল্পলোকের পন্থ।

খেলিছ এমনি লীলা-উদ্বেল, অমলিন-মণি-দীপ্ত,
কত না ভাবুক তব পাশে আসি'
এমনি হরষে আলোড়ি' উছাসি'
স'পেছে তোমারে অনঘ অর্ঘ্য, বিভোর অপরিতৃপ্ত।

এই সেই পুরী, এইখানে ডোবে নবদ্বীপের চন্দ্র,
তীর্থে তীর্থে ঘুরি' অবশেষে
উদাসীন প্রাণে এইখানে এসে
সমাহিত ওই নীল অনন্তে ভুঞ্জিতে ভূমানন্দ।

জগ-জনে তিনি দিয়াছেন কোল, কেহ নাই অস্পৃশ্য,
হোক্ না সে দ্বিজ, হোক্ চন্ডাল,
বিশ্বের স্রোতে ক্ষুদ্র, বিশাল,
সবারে সাদরে আলিঙ্গে কাল,—বর্জনে প্রেম নিঃস্ব।

একদা জগদ্‌গুরু শঙ্কর ভারতের বুধবৃন্দে,
নিষ্প্রভ করি' মনীষা-কিরণে
এইখানে আসি' তৃতীয়-নয়নে
নেহারিয়াছেন মহামানবের মিলনের অরবিন্দে।

ধন্য এখানে মানব-আত্মা পূজি' শাশ্বত-সত্যে,
একাকার হেথা অখিল ধর্ম,
টুটি' বিচারের কঠিন বর্ম,—
সব ব্যবধান ডুবে গেছে ওই পাবন সলিলাবর্তে।

কবীর নানক হরিদাস হেথা অবিনাশ বাক্-ছন্দে
উদ্বোধিলেন শুভ আহবানে
চির-মুমুক্ষু মানবের প্রাণে,
লভি' সাধনায় মধুমান্ সেই ধ্রুব সচ্চিদানন্দে।

এই শ্রীক্ষেত্রে লুটাও, ভক্ত, অভিমান হোক্ চূর্ণ,
হউক নিরাস ভেদ-জ্ঞান-ভ্রম,
জগন্নিধান পুরুষোত্তম
নীলমাধবের চরণোপান্তে হোক্ মনোরথ পূর্ণ।

ভো মহার্ণব, ভীম-ভৈরব, উত্তাল লীলাভঙ্গে
গর্জি' মেঘের মন্দ্র-সমান,
গাও,—গাও তাঁরি বন্দনা-গান,
রাত্রিন্দিব মাঙ্গলিকের ওঙ্কারধ্বনি-সঙ্গে।

রেবা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জল-বেণী-রম্যা রেবা হিল্লোলিয়া বরকান্তি উন্মাদিনী প্রায়,
অরণ্য-নেপথ্য-পথে তরঙ্গিছে শিলাঙ্গনে তুরন্ত ধারায়;
কুন্দবর্ণ বারি-ধূমে আবরি' সীমন্ত-বাস ধায় আত্মহারা—
কবে তুমি হে নর্মদা! বিদারিলে মন্ত্রবলে মর্মরের কারা?

ফাল্গুন-রজনীমুখে গুঞ্জরে তোমার বুকে অমরী-মঞ্জীর,
মানস-রঞ্জন হাস্য ভাসে ও কমল-আস্যে নিসর্গ-লক্ষ্মীর;
ইন্দ্রনীল-রথ-চূড়ে চন্দ্রিকা-কেতন উড়ে অন্তরীক্ষ-পথে,—
হেন স্বপ্ন-লীলা-ভূমি অবহেলি' ধাও তুমি দুর্নিবার স্রোতে।

কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-বসোল্লাসে, হে বরবর্ণিনি,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা, পারাবার-স্বয়ংবরা বিন্ধ্যের নন্দিনী?
কোথা মাহিষ্মতী পুরী? মর্মর-সোপানোপরি রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে চকিত-ঝঙ্কার!

পৌর্ণমাসী অর্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে অলিন্দের 'পরে,
দ্রাক্ষা-রসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব চুম্বিত অধরে।
আবর্ত-শোভন-নাভি অলঙ্কৃত কটি-তট হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে যৌবন-বিভায়?

পুষ্পিতা মাধবী সঙ্গে মধুপ মাতিলে রঙ্গে ফাল্গুনের দিনে
শ্বেতভুজা সারদার আরতির দীপালোকে উনমদ-বীণে,
আসমুদ্র-হিমাচল প্রকৃতির রম্য পট, রাজন্বতী মহী,
কি সৌন্দর্যে উদ্বোধিলা, অতুলনা ইতিকথা মহৈশ্বর্যময়ী।

কোথায় সে অবন্তিকা, কোথা নব-রত্নপ্রভা প্রাচ্যের গৌরব?
অস্ত জ্ঞান-বিভাবসু, ভারত-হৃদয়-কেন্দ্র সমাধি-নীরব!
উদয়-বিলয়-ভরা আবর্তিছে বসুন্ধরা, নাহি ক্ষোভ-কণা,
কোরকে প্রসূনে ফলে মঞ্জু কিসলয়-দলে অনন্ত-যৌবনা।—

প্রনষ্ট বিভব তরে, তবু খেদ-অশ্রু ঝরে বিধৌত শ্মশানে,
শোনে না বধির-মতি মৃত্যুর মঙ্গলারতি আনন্দ-বিধানে।

পাষাণ-পুলিনে তব কত যতি-তাপসের পূত নিকেতন,
হরীতকী-বনভূমে সুরভিত হোমধূমে সঘৃত ইন্ধন।

ত্রিকালজ্ঞ, মহাযোগী ভৃগুর সাধনাক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
যাঁর পূজ্য পদরজঃ মাধবের বক্ষে রাজে ভুবন-পাবন।
প্রাণায়াম-পরায়ণ সিদ্ধবাক্ ঋষিগণ ভাঙি' মঠাকাশ
নিভৃতে তোমারি পাশে, মিশেছেন মহাকাশে চিন্ময় সকাশ।

আজি যেন মূর্তি লভি' কত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ কবি সম্মুখে আমার,
মুরলীর মূর্চ্ছনায় নিবেদিছে আরাধ্যায় স্তোত্র-উপহার,—
যুগান্তের সিংহাসনে আজি তাঁরা পুণ্যশ্লোক, অমৃতায়মান,
লোকালোক-প্রান্ত থেকে রটিতেছে দিকে দিকে প্রতিষ্ঠার গান।

এ জীবনে কভু রেবা, ভুলিব না অভিরাম ভঙ্গিমা তোমার,—
সম্মোহন ধ্বনি তব বিহরিবে অন্তরের অন্তরে আমার,
করপুট ভরি' আজি স্ফটিকবর্তুল-রাজি করিনু সঞ্চয়,
সূর্য-কান্ত মণি সম রাজিবে যা' বক্ষে মম উজ্জ্বল অক্ষয়।

স্বপ্ন-দেশে

যতীন্দ্রমোহন বাগ

আজ, ফাগুনী চাঁদের জ্যোছনা-জুয়ারে ভুবন ভাসিয়া যায়,
ওরে, স্বপন-দেশের পরী-বিহঙ্গী, পাখা মেলে' উড়ে' আয়।
এই—শ্যামল কোমল ঘাসে, এই—বিকচ কুন্দরাশে,
এই—বন-মল্লিকাবাসে, এই—ফুরফুরে' মলয়ায়—
তোরা—তারালোক হ'তে কিরণসূতায় ধীরেধীরে নেমে আয়॥

দেখ্, ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায় সবুজ-স্বপন-সুখে,
দেখ্, পদ্মকোরকে অচেতন অলি শেষ মধুকণা মুখে!
হেথা—ঝিঁঝির ঝিঁঝিট তান, দেখ—নিশিশেষে অবসান,
ছোট—টুনটুনিদের গান এবে—বিরত ক্লান্ত বুকে;—
দেখ্, মোহ-মূর্চ্ছিত মুখর ধরণী, সব ধ্বনি গেছে চুকে'॥

তোরে, শিরীষ-ফুলের পাপড়ি খসায়ে পরাগ করিব দান,
তোরে, রজনীগন্ধা-গেলাস ভরিয়া অমিয়া করাব পান;
শেষে—ঘুম যদি তোর পায় হোথা—ঘুমাবি হিন্দোলায়,
মোরা—মৃদু দোল দিব তায়, গাহি'—মৃদু-গুঞ্জন গান,—
চারু—ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালে কেশরের উপাধান।

শেষে—জোনাকির আলো নিভিবে যখন ঊষার কুহেলিভারে,
মোরা—স্বপন-শয়ন ভাঙি' দিব তোর পাপিয়ার ঝঙ্কারে!
যদি—ফিরে' যেতে মন চায়, যাস্—ঝিরি ঝিরি ঊষা-বায়,
চড়ি'—প্রজাপতি-পাখনায় হিমসিক্ত শিশির ধারে;
সাথে—নিয়ে যাস্ এই রজনীর স্মৃতি ধরণীর পরপারে।

মাধবিকা

যতীন্দ্রমোহন

দখিন হাওয়া রঙিন হাওয়া নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী!
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আস্‌ছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির সন্‌সনানির গান করি';
মৌমাছিদের মনভুলানি গুনগুনানির সুর ধরে'—
চল্লে কোথায় মুগ্ধ পথিক পথটি বেয়ে উত্তরে?

অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক্ না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো!
তেমনি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেমনি গলার হাঁক্‌টি সেই,
দেখ্‌তে পেলেই চিন্‌তে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই!
কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে'
নারিকেলের কুঞ্জে-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে!

লক্‌লকে সেই বেতসবীথির বলো ত ভাই কোন্ গলি,
এলালতার কেয়াপাতার খবর ত সব মঙ্গলই?

ভালো কথা, দেখ্‌লে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,
বন্ধু বলে' চিন্‌তে কারো হয়নি তো সে সন্দেহ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্‌নি তো সব ভুল করে—
তেম্‌নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!

আস্‌তে যেতে দীঘির পথে তেমনি নারীর ছল করা;
পথিকবধূর চোখের কোণে তেম্‌নি তো সেই জলভরা?
রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুট্‌ছে তো,
শাখায় তারি দুলতে দোলায় তরুণীদল যুট্‌ছে তো?
তোমায় দেখে' তেম্‌নি ডেকে উঠছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীর্ষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ?

তেম্‌নি—সবি তেম্‌নি আছে!—হ'লাম্‌ শুনে' খুবখুশী,
প্রাণটা উঠে চন্‌চনিয়ে, মনটা উঠে উস্‌খুসি'!
নতুন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি,'—
বন্ধু তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছ্বসিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো গ্রহণ করো বন্ধু আমার দণ্ডেকের—
জানিনাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের!

গ্র্যাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক্‌ রোড্‌

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

চলিয়াছ তুমি সড়কের রাজা কলিকাতা হতে পেশবার,
সুবিধা পেয়েছ কত নদ নদী নগরীর সাথে মেশবার।
আঙুর পেস্তা কিসমিস লোভে জিভ করে নিশ্‌পিশ্‌
ডাকে 'খাইবার' গিরিপথ, ডাকে ডাকিনী এলায়ে কেশ-ভার।

ধর্ম তোমার বিশ্বজনীন, পথে পথে তব মন্দির
নগরে নগরে কত মসজিদ, গির্জার চূড়া গম্ভীর।
সমাধির যত গম্বুজ কালো নীরে শ্বেত-অম্বুজ,
রয়েছে দাঁড়ায়ে, স্বর্গে মর্ত্যে ফন্দী করিছে সন্ধির।

পথ দেখাইয়া পানিপথ দিয়া ভাঙ' গড়' কত দিল্লী—
কোথাও তোমার বাজিছে সারঙ, কোথাও ডাকিছে ঝিল্লি।
কোথাও মিনার চিক্কণ, কোথাও বীণার নিক্কণ,
কোথাও উগ্র ব্যাঘ্রের বাসা, কোথাও আভীর-পল্লী।

তুমি নিয়ে যাও দুর্বার সেনা, কামান, অশ্ব, হস্তী
দেশের ফসল নষ্ট করিয়া ছড়ায়ে মৃতের অস্থি।
লয়ে যাও দিবা রাত্রি ঝোলা ঝাণ্ডা ও যাত্রী,
সোহাগে কোথাও লোহাকে গলাও, মরু-বুকে গড়' বস্তি।

স্বর্গ না হ'ক, ভূ-স্বরগ যেতে সড়ক বানাল শের্ শা'—
সিধা আগাগোড়া, নয় বাঁকা-চোরা, কোনখানে নয় তের্ছা।
ভারতের দুই প্রান্ত এক করি' তবে ক্ষান্ত;
গঙ্গার তুমি সঙ্গীই বটো, দেখে মনে জাগে ঈর্ষা।

তুমিই মিশালে আমে আখ্রোটে, আলুবখ্রায় চালতায়,
এক পর্দায় ফুটি সর্দায়, ভিণ্ডি পালঙ পল্তায়।
বাঙালী এবং তুর্কে, দুর্গাবাড়ী ও দুর্গে,
জর্দার সাথে সাঁচি পান, আর সুর্মার সাথে আলতায়।

তুমিই মিলালে শালে মস্লিনে, হুঁকাতে মিলিল ফর্সী,
মিহিদানা পাশে বেদানা বসিল, বর্শার পাশে বঁড়্শি,
হিঙ্-জাফ্রান-গন্ধে মহুয়া মাতিয়া বন্দে;
ভুট্টা বাজ্রা গম ধান হ'ল একদম পাড়া-পড়্সী।

তুমি ঘরছাড়া বিবাগী বাউল, পায়ে পায়ে ধূলো উড়ছে—
কোথা খায় পাক ময়ূরের ঝাঁক, টিয়া টাকসোনা ঘুরছে।
হরিণ ঊষর ক্ষেত্রে চাহিয়া আকুল নেত্রে,—
বাঙালী পথিক, বাংলার লাগি মোর আঁখি তবু ঝুরছে।

মহাকাল

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি চলিয়াছ অনন্তপথে নীরব পদক্ষেপে
হে অতন্দ্রিত যুগযুগান্তর ব্যেপে।
কণ্ঠ তোমার বেষ্টিত হাড়মালে
ধকধক জ্বলে বহ্নি তোমার ভালে
বাজে ডম্বরু ভুজগ গরজে ধরা উঠে কেঁপে কেঁপে।

শিলা-মর্মরে মানুষ মাটিকে আকাশে তুলিছে বটে,
ফিরে আসে মাটি মাটির সন্নিকটে।
কত প্রতিমার হেরিছ নিরঞ্জন,
কত রাজ্যের উত্থান নি-পতন,
তুমি কোনো রঙ স্থায়ী রাখনাকো মাটির ধূসর-পটে।

কাল ব্যাবিলন, আজ লণ্ডন, কোথায় পরশ্ব?
কে বুঝিবে তব গতির রহস্য?
এই প্রচণ্ড আর্ণবিক সভ্যতা,
দেখিতে দেখিতে হ'য়ে যাবে উপকথা,
ক্ষ'য়ে খ'সে গেল কত রবি-শশী রেখে শুধু ভস্ম।

যেখানে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকীয় দপ্তর,
হয়তো সেখানে জমিবে তুষারস্তর।
শ্বেত ভালুকেরা আসিয়া বাঁধিবে ডেরা,
বল্গাহরিণ সহ শীল-মৎস্যেরা,
পেনগুইনের ঝাঁক ডেকে এনে বাঁধাবে গোপনে ঘর।

অভ্রংলিহ জয়-তোরণের জং-ধরা ইস্পাত,
ভূমিসাৎ হবে হয় তো অকস্মাৎ।
মানুষের গুরু-গর্বিত ইতিহাস,
জাগাবে কেবল তোমার অট্টহাস,
তব পঞ্জীতে তাহাদের আয়ু হয়তো একটা রাত।

পতনের গতি কারও দ্রুত অতি কারও কিঞ্চিৎ ঢিমা
সীমা-শেষে গিয়া সব হবে হিরোশিমা।
পরিণামে এক শ্মশানে সবারি ঘর,
সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হ'তে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

তাসের দুর্গ, পাতার প্রাসাদ, কাগজের রাজধানী
সৈকতে তারা জলরেখা যায় টানি'।
পঞ্চভূতেরা গায়ে রাখেনাকো ছোপ,
দগ্ধ মগ্ন করে ভেঙে করে লোপ,
মানুষ কিন্তু করিতেছে তবু অমৃতের সন্ধানই।

ভঙ্গুর ভাঙা পানপাত্র ও রাঙা বোতলের সার
পরিচয় দেবে বিরাট সভ্যতার।
ক্ষয়া ইঞ্জিন, উড়োজাহাজের চাকা,
বোমার টুকরা ফাঁসিকাঠ মাটি ঢাকা,
সৃষ্টিবিনাশী কৃষ্টির হবে সাক্ষী চমৎকার।

তব সাথে চলে কীর্তি যশের বিপুল পণ্য ল'য়ে
আহা কতজন জয়-গর্বিত হ'য়ে।
প্রোজ্জ্বল যাহা কোথা ডুবে যায় নিভে,
নিষ্প্রভ হয় পরিণত মণিদীপে,
তোমার নিকট কার কত দর খাঁটি ক'রে দেয় ক'য়ে।

স্তব্ধ হইবে সকল শব্দ, রবে শুধু ওঙ্কার
সব রূপ একরূপে হবে একাকার।
দুরাশা আমার,—পুড়ে যবে হবো ছাই
তোমার অঙ্গে বিভূতি হইতে চাই
হে দেব রজত-গিরি-সন্নিভ—তোমাকে নমস্কার।

ভাঙা বেহালা

কুমুদরঞ্জন

তার তার ছিঁড়ে গেছে কোণে আছে টাঙানো
থাক থাক ভালো নয় তার ঘুম ভাঙানো।
নাই সুর সুমধুর মীড় আর খেলে না
আড়ানার সাড়া নাই মেলেনাক তেলেনা।

নাই আর ঝঙ্কার বারোঁয়া কি ইমনে
চুপ করে ঝিমাইছে ভাবিতেছে কী মনে।
মনে বুঝি পড়ে তার অতীতের গরিমা,
জাগিতে যে পারে না সে কি নিবিড় জড়িমা।

বুকে তার বয়েছিল, পুলকের লহরী
এসেছিল কত রাগ রাগিণীর বহরই।
সত্য কি সুরনদী সিকতায় হারালো?
দেবতা কি দারুসার ছবি হ'য়ে দাঁড়ালো?

প্রাণ তার ভরপুর 'সাহানা'র সোহাগে,
ভোগবতী ধারা টানে সুর-শরে বেহাগে,
মল্লার আনে তার পথহারা পুলকে,
অলকার বারতাটি এ নীরস ভূলোকে।

মরে নাই ঘুমাইছে বুকে রাগ রাগিণী
শ্রমে আঁখি মুদে আছে এখনো ও জাগেনি।
যে ভ্রমর গুমরিয়া এতদিন কেঁদেছে
মধুভরা মৌচাকে আজি বাসা বেঁধেছে।

সমরের শেষ তার, আজ তার ছুটি রে,
স্মরে জয়-গৌরব বসি' একা কুটীরে।
আজ রথ থামাইয়া ঝিমাইছে সারথি,
পূজা শেষ ক'রে এবে মনে মনে আরতি।

কবর-ই-নূরজাহান্

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"বর ম্যজারেমা গরীবা ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে!
ন্যঃ পরে পরমানা সুজদ্ ন্যঃ স্যতায়ে বুলবুলে॥"

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখবো তোমায় সুন্দরী!
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান-নূরী আলোয় ভর দিক আবার।

রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো;—
তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুই ধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না তা পোদ্দারে।

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা!
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা টিঁকল না দু দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানি! তুমি মেহের-উন্নিসা!
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চিরদিন-নিশা!

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায়!
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফ্‌গান;
সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারির তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ!

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এমনি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত সাগরের শোভার সার।
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শা হ'লে, বাদ্‌শা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরান যে স্ফূর্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধা কবি আসফজা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে!
তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহি।

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী!
হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজল ভায়
ঝলমলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আলপনায়।

গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি!
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সুতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায়!
আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।
বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
গোরী! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপী চন্দন এ।
সোহাগী! ও দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ!

* * *

শিয়রে কি লিখন লেখা! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক;—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক;—
হে সুলতানা! লিখেছ এ কী আফশোশে সুন্দরী!
লিখলে তুমি "গরীব আমি" পড়তে যে চোখ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জেবল না ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জবলে না, নূরজাহান!
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে।
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জবলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা! চির যুগের সুন্দরী! (আংশিক)

বৈকালী

সত্যেন্দ্রনাথ

অকূল আকাশে অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।

নিষ্প্রভ আঁখি নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

দিনে দু'পহরে সৃষ্টি যেতেছে মুছি';
দৃষ্টির সাথে অশ্রু কি যায় ঘুচি?
হায়গো কাহারে পুছি!

একা একা আছি রুধিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মানুষ সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর?

স্মরি একা একা পুরানো দিনের কথা,
কত হারা হাসি কত সুখ কত ব্যথা,
বুক ভরা ব্যাকুলতা।

দিনেক দু'দিনে মোহনিয়া হ'ল বুড়া!
অভ্রের ছবি ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
ডাঁটা-সার শিখি-চূড়া।

স্মৃতি-যাদুঘরে যতগুলি ছিল দ্বার
উঘাড়ি উঘাড়ি দেখিনু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর।

চিত্ত না মানে বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু অধিক নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার।

ফাগুনের দিনে একি গো শ্রাবণী মসী
বিনা মেঘে বুঝি বজ্র পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশ্বসি।

সহসা আঁধারে পেলাম পরশ কার?—
কে এলে দোসর দুঃখে করিতে পার,
ঘুচাতে অন্ধকার?

কার এ মধুর পরশ সান্ত্বনার?
এতদিন যারে করেছি অস্বীকার!—
আত্মীয় আত্মার!

এলে কি গো তুমি এলে কি আমার চিতে?
পূজা যে করেনি বৈকালী তার নিতে?
এলে কি গো এ নিভৃতে?

দুঃখ-মথিত চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-মণির জ্যোতি কি জ্বলে!
অতল অশ্রু-তলে!

বাহিরে তিমির ঘনাক এখন তবে
আজ হ'তে তুমি রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে।

দুটি হাত দিয়ে ঢাক যদি দু'নয়ন,
তবুও তোমায় চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন!

পদ্মের মত নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয়।

আজ আমি জানি দিয়েও যে হব ধনী—
চোখের বদলে পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী। (আংশিক)

ব্যথার স্মৃতি

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

জীবনের মত বসন্ত গত;—কাঙালের মত সরিয়া
পড়ে পথ-পাশে মিশে থাকি ঘাসে, চোখ জলে আসে ভরিয়া।
চুড়ি'য়ালা হাঁকে, জানালার ফাঁকে কত জন ডাকে—'এ বাড়ী!'
আধ ঘোমটায় মুখ দেখা যায়, মন চমকায় ফি-বারই।
বাসন্তী রং কাঁচের বাসন আরো কি-রকম কত কি—
পথে হেঁকে-হেঁকে যায় ডেকে-ডেকে কে তাদের দেখে নিরখি!
ভেল্‌ভেট-পাড় জরি বুটিদার পড়েনাকো আর নয়নে;
ফিরি আর কৈ পছন্দসই এটা-ওটা ঐ চয়নে!

চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা চলে যায় সরাসর ঐ,—
উদ্বেগ—মাখা-পথ-চেয়ে-থাকা বুকে-করে রাখা চিঠি কৈ?
মরণের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে;
এটি-উটি-সেটি লিখে চার পিঠই একখানা চিঠি দিত সে;—
একি জাল-বোনা হায় কল্পনা! মনে আল্‌পনা আঁকা গো,
মরি কত ছলে স্মৃতিশতদলে ধুয়ে আঁখি জলে রাখা গো!
সাগরে সলিলে আকাশে অনিলে বিশ্বনিখিলে দেওয়ালী;—
চমকায় দিল্ আলো রঙ্গীল—সবুজ সুনীল সোনালী!

ছোটে তর্-তর্ হাসি-নির্ঝর—মণি মুক্তোর ঝরনা
টুটি আবরণ—রেশমী বাঁধন আসমানি রঙ্-ওড়না।
হেনা-চামেলির মিঠে সুরভির মদিরে সমীর মত্ত
আনন্দগান ভরে তোলে প্রাণ, নাচে আন্‌চান রক্ত।
এত আলো গান হাসি অফুরান সবই ম্রিয়মাণ লাগে যে—
কুটীর আঁধার, নিবিড় ব্যথার স্মৃতি শুধু তার জাগে যে!
তাই নিশিদিন ফিরি উদাসীন উৎসাহহীন আলসে,
ফেলি আঁখিলোর কোথা মনচোর—নয়নের মোর আলো সে?

সেই একদিন প্রথম নবীন স্বপ্নবিলীন শ্রাবণে—
লোপ সৃষ্টির শুভ দৃষ্টির সুধাবৃষ্টির প্লাবনে!
আর একদিন বিদায়-মলিন চেতনাবিহীন চক্ষে
হইল ধরণী পাণ্ডুবরণী হানিল অশনি বক্ষে!
বকুলের বনে পবনে-পবনে এইসব মনে পড়ে গো,
যে ছিল সে নাই, হয়ে গেছে ছাই, জলে আঁখি তাই ভরে গো! (আংশিক)

লোহার ব্যথা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাইকো কর্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধরেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হল,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে,
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্র-মুঠি।
রাত্রি দুপরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা ক'রে।
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম,
কভু বা সলিলে শীতল করিলে অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
বড় হতে কভু বাহুল্য বোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন এত পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হয়ে তাই ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।
আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়িব ঘায়।
যাহা অন্যায় হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হয়ে সহি শান, পা'ন, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিনরাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরী—নেহাই হাতুড়ি—ভাই হয়ে ভাইয়ে পেটে।
ও ভাই কর্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার,—
কহগো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়িব মারফতি!
কি কহিছ ভাই আমি হব তুমি—এই প্রেম সহি যদি?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি?

ভিখারী দেব

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

খেটেখুটে ফিরি শূন্য কুটীরে, দেহখানা আজ কী অবসন্ন!
কে তুমি ঠাকুর? এ অপরাহ্নে গরীবের দ্বারে কিসের জন্য?
আমার যে নাই কাজের কামাই,
দাঁড়াও, কাঁধের লাঙল নামাই।—
এইবার বল' কি তোমার চাই, কে তুমি এ গৃহ করিলে ধন্য?
মুখখানি দেখে মনে হয়, আহা, কতদিন যেন জুটেনি অন্ন।

এমন শত্রু কে ছিল তোমার গলায় জড়ায়ে দিল ভুজঙ্গ?
ছেঁড়া বাঘছাল বাঁধিয়া কটিতে ভস্মে লেপিল ও কাঁচা অঙ্গ?
মরি মরি, ওকি কাস্তের ঘায়
কপাল কাটিয়া লোহু বাহিরায়?
এ দশা হ'ল কি বামুন-পাড়ায়? তাই খুঁজিতেছ চাষার সঙ্গ?
ভূতের মতন পাড়ার ছোঁড়ারা দূর হতে সব দেখিছে রঙ্গ।

বিহানের ফোটা পদ্মের মতো হাত পেতে তুমি মাগিছ ভিক্ষা,
নাই কাঁধে ঝুলি হাতে করঙ্গ, ভিখারী হবারও হয়নি শিক্ষা?
মুঠো ভ'রে যদি চাল দিই ভাই
ফুটিয়ে খাবে যে সে ক্ষমতা নাই,
হেন নিরুপায়ে ঘরছাড়া ক'রে কোন ঠাকুরাণী লয় পরীক্ষা?
কেমন সতী সে এমন পতিরে দিল ভবঘুরে হবার দীক্ষা?

দেখিনি এমন পরম দুঃখী, জন্মও হেন বোকার বংশে,—
নীল হ'য়ে আহা উঠেছে কণ্ঠ বুকে তুলে-রাখা সাপের দংশে।
মরি মরি মরি ঢুলে পড়ে আঁখি,
ও বিষ হজম, কথার কথা কি?
আহা-হা এ দশা যে করিল তব দেখাতে পার কি সেই নৃশংসে?
বুঝে নিই তারে,—আমারো জন্ম গোঁয়ার বলাই চাষার অংশে।

যাই হোক ভাই, কোন ভয় নাই, রোজা ডেকে বিষ নামায়ে নিব.
কপালের ক্ষত শুকাবে দুদিনে স্নিগ্ধ প্রলেপ বাঁধিয়া দিব।
বাঘছাল খানা ছেড়ে ফেল ভাই,
ধুয়ে মুছে দিই অঙ্গের ছাই,
মারিয়া তাড়াই সাপের বালাই সকল অশিব হইবে শিব।
লক্ষ্মীটি হ'য়ে লহ যদি সেবা তবে তো বুদ্ধি প্রশংসিব।

ভাল হ'য়ে ওঠো,—দুজনে মিলিয়া লেগে যাব মোরা ক্ষেতের কাজে,
মুখখানি বুঁজে সহো যত ব্যথা ভুলেও সে কথা ভুলিব না যে।
পরস্পরের দুখ লব বে'টে
বর্ষা ও খরা সমভাবে খেটে
সোনার ফসল ফলাব যখন রব উঠে যাবে গাঁয়ের মাঝে।
ছি ছি ভাই, এই জোয়ান বয়সে ভিক্ষা করা কি তোমার সাজে?

আর যদি তোরে না পারি সারাতে, দুঃখের বোঝা নামাতে নারি,
দুয়ার হ'তে কি, ওগো অসহায়, চাল-মুঠো দিয়ে ফিরাতে পারি?
সংসারে মোর আছে আর কেবা,
জীবন কাটাব করি' তোরি সেবা;
দেব্‌তা মানুষ ক্ষ্যাপা কি ভিখারী যাই হোস্‌ মোরে যাসনে ছাড়ি;
সকল ব্যথার ব্যথিত দেখিয়া দুটি চোখ আজ হ'ল যে ঝারি।

জেব-উন্নিসা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

তোমার নিকুঞ্জ আজি জনশূন্য, সম্রাট-নন্দিনি!
নাচিয়া ছুটিত যেথা কুসুমিত তরুবীথি দিয়া
তরঙ্গিত ছন্দে ছন্দে কাননের নটিনী তটিনী;
আজি সেথা ধূ ধূ মরু ভগ্ন কুঞ্জ তোরণ বেড়িয়া;
বিশুষ্ক গোলাপ-বাগ; বুলবুল উড়ে গেছে আজ
তারায় তারায় স্মৃতি আশমানে করিছে বিরাজ।
তুমি নাই, তবু ভক্ত কহে যেথা ভগবৎ-কথা,
ধর্মপ্রাণ সূফী-কবি বেদীমূলে মিলে যেথা আসি;
বহু পুণ্যকণ্ঠে সেথা কাঁপে তব হৃদয়-বারতা,
বন্দিত তোমার নাম, সৃষ্টি তব সেথা অবিনাশী
বহে আজো তব বাণী সন্ধানীর নয়নের আগে—
সে পরম-পুরুষেরে, রূপ যাঁর ধ্যান-লোকে জাগে।
ভাষাধর্মভেদ ভুলি- তবু আজ আমরাও তাই
পশি' সে রহস্যঘন কবিতার উপবনে তব
যেথা তুমি হোমানলে বাসনারে করেছিলে ছাই,
রুবাই গজলে তব দিই রূপ সুর অভিনব।
আশা,—বাঁধি বাক্যজালে, স্বপ্ন তব নিগূঢ় আত্মার,
বহ্নিপক্ষা হে কপোতী, বার্তাবহা—অতীন্দ্রিয়তার।

কালাপাহাড

মোহিতলাল মজুমদার

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা!
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা!
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?—
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড়!

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান!
এতদিন শুধু লাল হ'ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান!
আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জন মহোচ্ছ্বাস!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে!—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

কোটি-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নিঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে!
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা!
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নির্জের অমৃত-তৃষা!
আজ তারি শেষ! মোহ অবসান!—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই! তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া নাকাড়!
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে, দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার!
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া।
ভৈরব রবে মূর্চ্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া।
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘন্টার রোলে জাগেনা আর।
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড়!
—কালাপাহাড়!

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায়, দুর্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!

কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র সুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয়!
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিষহ!
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ!
স্তম্ভিত হৃৎপিন্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড়!

ভেঙে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া দারু-শিলা কর নিমজ্জন!
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন!
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ংকরের ভয় ভেঙে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়?
—কালাপাহাড়!

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে!
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে!
মরুর মর্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসা-হরা!
কল্লোলে তার বন্যার রোল!—কূল ভেঙে বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই!—মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূখ-হার!
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে!—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়!

শুনিছ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল!
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়! কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ! ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান।
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়
ওই আসে! ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়!

বসন্ত আগমনী

মোহিতলাল মজুমদার

যাই যাই করে শীত চলে' গেল সেদিন কুহেলি প্রাতে,
আজি সন্ধ্যায় বসন্ত এল, পঞ্চমী-চাঁদ সাথে।
কতদিন পরে আজিকে ফিরিল ধরণীর বরণীয়—
দক্ষিণ-বায়ে উড়িতেছে তার পরাগ-উত্তরীয়!
রাজার নকীব বাসন্ত-পিক ফুকারিল দিক্-পথে—
হয়েছে সময় ঋতু অধিপের আসিবার ফুল-রথে!
পতঙ্গ-পাখী মধুপ-পুঞ্জে মুখরিত দশ দিশি,
কি নেশা বিলায় মাতাল বাতাস গানে ও গন্ধে মিশি'!

সারা দিনমান গাইয়াছে গান বসন্ত-আগমনী,
অরুণ উঠিছে তরুণ-বদন নবীন আশার খনি।
পল্লব-মুখে চুম্বনসম আলোকের পিচ্‌কারী!
সুরভি নেশায় মশ্‌গুল্‌-করা মধুভরা ফুলঝুরি—।
আম্র মুকুলে ভরেছে দুকূল সকল বনস্থলী,
গ্রাম-পথে-পথে সজিনার ফুলে দিয়েছে লাজাঞ্জলি!
আলিপনা এঁকে বসন্তশ্রী-পঞ্চমী আবাহন—
ঘরে ঘরে আজ হ'য়ে গেছে পূজা, সুমধুর আয়োজন!

কাননে কাননে শুনিয়া ফিরেছি সকল পাখীর শিস্‌
ধান্যবিহীন ক্ষেত্র-সীমায় আহরি' যবের শীষ;
স্তব্ধ গভীর নিথর সলিলে আকাশ দেখিছে মুখ,
গুঞ্জন-ভরা বাতাসের শ্বাসে কভু বা কাঁপিছে বুক,
আতপ্ত দিবা-দ্বিপ্রহরের আলোক-মদিরা পিয়ে,
রসালসে দেহ এলায়েছি মোর ছায়াতরুতলে গিয়ে।
শিয়রে আমার চাহিয়াছে দুটি আঁখিসম নীল-ফুল,
তাহারি স্বপন দেখেছি জাগিয়া, কেবলি করেছি ভুল!

পথ দিয়া যবে ঘরে ফিরিয়াছি দিবসের পরিশেষে,
বালকের মত বাসক-বৃন্ত চুষিয়া, একেলা হেসে—।
ধূলার উপরে হেরিলাম ছবি, অস্ফুট-রেখায় আঁকা,
ছায়াখানি মোর চলিয়াছে পাশে মদনের ধনু বাঁকা।
উদিয়াছে চাঁদ, দেখিনু তখন আকাশের পানে চাহি',
অলখিতে ওঠে মাঠ-বাট ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় অবগাহি'!

মন্থর নেবু-মঞ্জরী-বাস অন্তরে গিয়ে পশে,
কেদারবাহিনী—দখিনা বাতাসে কত কথা কহিল সে!

কতদিন পরে ঘরে ঘরে আজ বাতায়ন খুলিয়াছে!
সোহাগিনী ওই করবীর ঝাড় পাশে তার দুলিয়াছে।
ঝির্ ঝির্ ঝির্ বহিছে সমীর, বাঁশীর রাগিণী ভাসে,
আজিকে চাঁদনী-চাঁদোয়ার তলে প্রাণ খুলে' কারা হাসে।
এমন সময় যদি কেহ ডাকে কানে কানে 'প্রিয়তম'!—
গীত গেয়ে পারি উত্তর দিতে প্রতিধ্বনির সম।

মরমের কথা কহেনি যে-জন, আজিকে কহিবে যে সে,
কঠিন হৃদয় আজিকে হইবে কৃতার্থ ভালোবেসে!
মনে হ'ল আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব,
রঙীন এ রাতি, বাসনার বাতি যত আছে জ্বালো সব!
তৃণভূমি পরে বসিয়া ক্ষণেক হেরিলাম নিশানাথে,
বুঝিনু আবার বসন্ত এল পঞ্চমী-চাঁদ সাথে!

কয়েদী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বনের বাঘা, বনের বাঘা! খাঁচায় পুরে বাঁধলে কে?
চিড়িয়াখানার সং সাজিয়ে, সুখেতে বাদ সাধলে কে?
জ্বল্‌জ্বলিয়ে দেখছে চেয়ে, হাততালি দেয় ছেলেমেয়ে,
নল্‌খাগ্‌ড়ার দোদুল বনে নিঠুর ফাঁদ সে ফাঁদ্‌লে কে?

বাঘা ছিল বনের দুলাল,—মাথায় ছিল নীলাকাশ,
থাবার তলায় কাঁটাও ছিল,—ছিল নরম দুর্বাঘাস!
রাতদুপুরে নদীর তটে, মরণধ্রুপদ কণ্ঠে রটে,
উঠ্‌ত পড়্‌ত ছুট্‌ত উধাও, ফেল্‌ত হু-হু ঝোড়ো শ্বাস!

আজ্‌কে দেখি কুলুপ—দেওয়া খাঁচাটার ঐ তিন-দোরে,
কোটর-গত চক্ষু দুটো, উদর অস্থি-লীন ওরে!
নেইকো খোলা মাঠের বাতাস, নেই আকাশের অসীমাভাস,
আছে সুধুই অন্ধকার আর গতির বাধা পিঞ্জরে!

সোঁদর-বনের সবুজ-স্বপন ভোলেনি ও ভোলেনি!
চুপটি ক'রে আছে,—কারণ খাঁচার দুয়ার খোলেনি।
বনের কথাই মনের কথা, ভাবচে এবং পাচ্ছে ব্যথা,—
দেখচে চেয়ে,—ঝড়ের ঠাকুর মেঘের নিশান তোলেনি!

উঠ্‌বে জ্বলে' চোখ-দুটো ওর—যে চোখ এখন ঘোলাটে,
ঝল্‌বে যেদিন আগুন-ত্রিশূল কালো মেঘের ললাটে!
খাঁচার মালিক শুন্‌বে তখন বাঘার গলায় বাজের বাজন।
হাঁক্‌বে যেদিন পাগ্‌লা ঝোড়ো,—ভাঙবে লোহার কবাটে,
—বনের বাঘা ভুল্‌বে দাগা, রইবে না চোখ ঘোলাটে।

রসলক্ষ্মী

নরেন্দ্র দেব

ওগো, ঊষার আলোকে হেসে,
কে তুমি আজি এ শিশির-প্রভাতে দাঁড়ালে দুয়ারে এসে?
তোমারে কখনো দেখিনি ত আগে,
তবুও ও মুখ বড় চেনা লাগে;
কী যেন অসীম স্নেহ অনুরাগে দেহ মন যায় ভেসে;
দুয়ারে আমার কে এলে গো আজ এমন দীপ্ত বেশে?
ওগো, তোমার চরণতলে,
আঙিনা আমার ভরে যে উঠিল, ফুলে ফলে তৃণদলে!
মরি মরি দেবি, এ কি বিস্ময়,
নিমেষেই এসে করে নিলে জয়,
আমার কঠিন সুপ্ত হৃদয় না জানি এ কোন্ ছলে?
আঁধার মনের মন্দিরে আজ তোমারই প্রদীপ জ্বলে!
দেবি! অবাক এ আগমন,
বিশ্বের এই নিঃস্বের দ্বারে তোমার পদার্পণ!
হাসিতে যাহার সহাস্য দিক,
আঁখিতে উজল নবীন নিমিখ,
কোমল কণ্ঠে কূজে কোটি পিক চঞ্চল ত্রিভুবন;
দীনের দুয়ারে দাঁড়ালে সে কোন নিখিলপূজিত ধন!
দেবি! তোমার করুণা কণা,—
যেন অযাচিত আশার অতীত আনন্দ মূর্চ্ছনা।
জেবলে দিল প্রাণে এ কি অপরূপ
নব জীবনের সুগন্ধ ধূপ,
অমৃত সরস প্রতি রোমকূপ, যৌবন উন্মনা!
আমার চিত্তে নিত্য তোমার আরতি ও উপাসনা।

খণ্ডকপালী

কালিদাস রায়

সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা আর রহিলে না তুমি,
ঋষি বঙ্কিম বন্দিল যারে বলিয়া মাতৃভূমি।
রুক্ষ ঊষর বক্ষে ধূসর ধূ-ধূ শুধু প্রান্তর
ডাউক-বলাকা-চখাচখী-ডাকা কোথা গেল বালুচর?
কোথা গেল খরা নদীবুকভরা পাল-তোলা শতশত
সারি সারি তরী রাজহংসের মতো?
কোথা গেল পদকমল ঘেরিয়া কল-মরালের তান
বৈঠার তালে তালে ভাটিয়ালী গান?
কোথা গেল পূগবীথি-পরিবৃত সোনা-ফলা অঙ্গন?
কোথা গেল কল-কাকলী-মুখর বেণু-বেতসের বন?
কোথা সে অট্টহাস্যে ফেনিল পট্টবসন গায়,
স্তন্য সহসা তব পয়োধরে শুকাইয়া গেল হায়।
দুধের তৃষ্ণা মিটিবে কি হায় ঘোলে?
শিশুরা পিঠালি-গোলা দুধ বলি পিইবে তোমার কোলে?
সিনানে নামিলে চিক্কণ মীনপাঁতি
তব কটি বেড়ি নিক্বণহীন মেখলা দিবে না গাঁথি।
দিনের অতিথি ভানু ফিরে যাবে বুকে অতৃপ্ত তৃষা,
বিগলিত কলধৌত ধারায় সেবিবে না তোমা নিশা।
শীকরসিক্ত চিকুর তোমার করি আর পরশন,
শীতল হবে না নিদাঘের সমীরণ।
কোথা গেল গলে নীলোৎপলের মালা?
পরিলে পদ্মবীজের মাল্য রুদ্রাক্ষের বালা।
হারাইয়া হিম-গিরির প্রসাদ, বরুণের ভাণ্ডার
ফল্গুধারার সন্ধানে রবে কুক্ষিতে বসুধার?
খণ্ডকপালী, চিরবাঞ্ছিতে লভিলে গভীর রাতে,
গাঙ্গুড়ের ভেলা প্রাতে।
তোমার ভাগ্যে এই কি লিখিল ধাতা
আর নহ হায় সীতারাম রায় চাঁদ প্রতাপের মাতা।
কবির পদ্মা, চলিল ভাসিয়া একদা যাহার বুকে
পাকা ধানে ভরা সোনার তরীটি অসীমের অভিমুখে,
সে পদ্মা আর নয় মা তোমাব শাখা হ'ল তার পুঁজি।
ইন্দ্রের রথ হারাইয়া পথ তোমারে পাবে কি খুঁজি?

পূর্ণ মুক্তি-চন্দ্রের তরে তপে পেলে অভিশাপ
লভিলে অর্ধচন্দ্র তাহার জ্যোৎস্নায় বড় তাপ।
ময়ূরাক্ষীটি রহিল তোমার কপোতাক্ষীটি কই?
অন্নদা বলি ডাকি মা তোমায় কেমনে ধন্য হই?
তুমি একাক্ষী মনসা হইলে—কোন সাধু সদাগর
পূজিবে না তোমা জননী অতঃপর।
কর্ণভূষণ রচিবে না আর কুসুমে কর্ণফুলী
মেঘনা তোমার চোখে বুলাবে না মেঘলা কাজল তুলী
বৎসরান্তে অম্বিকা তব ঘরে
আসিবে ঘোটকে, আসিবে না আর ভরা পাল তরী 'পরে।
মুক্তির লাগি বুকের রক্ত অঝোরে ঢালিল যারা
বরণ করিল মরণ সমান কারা,
তারাই তোমার 'প্রবীরকুমার'। তাহাদের পরিণাম
স্মরিতে অশ্রু ঝরে আজ অবিরাম।

কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহার

কালিদাস রায়

মত্ত করি' করভকে, ফুল্ল করি' কুরবকে
দিকেদিকে বসন্ত-বিলাস।
এক পাত্রে মধুব্রত, প্রিয়া সহ পানে রত
সারীশুকে সরস সম্ভাষ।
রুধিয়া ইন্দ্রিয়গণে, মুদি আঁখি যোগাসনে
মগ্ন তুমি মহাসাধনায়;
কর্ণে কর্ণিকার-ভূষা, স্বর্ণময়ী যেন ঊষা,
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায়।

যোগভঙ্গ অকস্মাৎ করে বহ্নি-শরাঘাত
ত্র্যম্বকের ললাট-নয়ন;—
জ্বলে শুষ্ক পত্রচয়, গ্রীষ্ম এল উষ্মাময়,
ভস্মীভূত মকরকেতন।
বহ্নিকুণ্ড-মধ্যগতা, তন্বী উমা তপোব্রতা,
শূন্যপানে সূর্যে রাখি আঁখি;
তরু-পর্ণ পানবারি, অনশনে তাও ছাড়ি,'
অস্থিচর্ম আছে তার বাকী।

বরিষার বারি ঝরে, জীর্ণ ধরণীর 'পরে,
চাতকীর দীর্ণ কণ্ঠ মাঝে;—
তপঃক্ষামা গিরিজারে, তুমি এলে ছলিবারে,
মেঘবজ্রে নবছদ্মসাজে।
পরিণত তপঃফল, আঁখি তার ছল ছল,
পল্লবিত পুলক-অঙ্কুর।
শতগুণে কান্তি তার উপচিত পুনর্বার,
সর্বদাহ-জ্বালা হলো দূর।

আসিল শরৎ সিত, গন্ধবহ আমোদিত,
চন্দ্রিকার বন্যা নীলাকাশে,
কৈলাস-শৈলের 'পরে লীলা-শতদল করে
হৈমবতী হাসে তব পাশে।
সুরভি লহরী ঠেলি, অবিশ্রান্ত জলকেলি,
রচে মীন মেখলা সুন্দর।
মরকতপুঞ্জ মাঝে উমার মঞ্জীর বাজে,
সিংহ পায়ে দুলায় কেশর।

হেমন্ত আসিল ধীরে, হিমাক্ত সংকোচ ঘিরে
অতসীর হেমাভ বয়ানে।
আপাণ্ডুর গণ্ডখানি তুলি' উমা জুড়ি' পাণি
চাহে নর্মবিমুখ নয়ানে;
শস্যগর্ভা শালিনিভা অন্নপূর্ণা নতগ্রীবা,
দোহদ-লক্ষণ সারা গায়।
পল্লবিনী অঙ্গলতা পীনশ্রোণিভারানতা,
আকম্পিত লজ্জায় কুণ্ঠায়।

শীত এল পথে ঘাটে, স্বর্ণশস্য মাঠে মাঠে
শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে।
লাজ-বর্ষ গেহে গেহে, রোমহর্ষ দেহে দেহে,
হর্ষ ঝরে অনলে তপনে।
হারিদকাজলমাখা ক্ষুমাবাসে আধ'ঢাকা
কুমার উমার কোলে হাসে।
তোমার তৃতীয় চোখে সুধা ক্ষরে চন্দ্রালোকে,
কুন্দদন্তে উমা হাসে পাশে।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

সুশীলকুমার দে

চিনিলে না তারে, তাই চলে গেল,—তবু কেন বারে-বারে
অজানার ব্যথা নিগূঢ় আঘাত করে মর্মের দ্বারে?
যা'-কিছু রম্য, যা'-কিছু মধুর
করে কেন আজ হৃদয় বিধুর?
কত জনমের চির-বিস্মৃত পরিচয় বুঝি তারে
বিহ্বল করে ভাব-সুনিবিড় বেদনার হাহাকারে।

যে-নয়ন তুমি ফিরালে সেদিন হাসি' অবজ্ঞাভরে
সে-নয়নে আজ আঁধার নেমেছে, অবিরল ধারা ঝরে;
অকরুণ তুমি দেখনি সেদিন
মুখখানি মূক দুঃখ-মলিন,
আঁখির পদ্ম মথিত নিবিড় অশ্রুর নির্ঝরে,—
তাই চোখে তব সেই নির্ঝর, মুখে কথা নাহি সরে।

স্মৃতির শিখায় প্রীতির প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করি'
অবোধ হৃদয় আশ্বাস মাগে অদৃশ্য পায়ে পড়ি'।
অনাদরে ঝরি' মুকুল মিলায়,
তবু অগোচর গন্ধ বিলায়;
অঙ্গুরী তার ফিরে এল, তবু কোথা সেই সুন্দরী?
শুধু নাম জপি' কাটে না ত আর বিরহের বিভাবরী।

তাই রূপরস-পরশ মাগিয়া বিরহের তীরে-তীরে
অনঙ্গ আজ অঙ্গের লাগি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে;
দেহের সেহটি বেড়িয়া অপার
বিদেহ বাসনা করে হাহাকার;
ফুলকুন্তলা শকুন্তলা সে জাগে আজ আঁখিনীরে
একবেণীধরা পাণ্ডু-অধরা বিরহের মন্দিরে।

দু'জনার বুঝি ভাব-বন্ধন আবার নূতন করি'
বাঁধিবে ক্ষুদ্র দু'টি শিশুকর পরশের রসে ভরি';
দু'জনে চুমিয়া সে-মুখকমল
হবে দু'জনার নয়ন সজল,
শিশু-অঙ্গের ধূলার পরশ আপন অঙ্গে ধরি';
পরিণত হবে শরতের ফলে বসন্ত-মঞ্জরী। (শকুন্তলা)

সম্ভোগ

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সুধার ধারা যাচ্ছে বয়ে মিটাও ক্ষুধা প্রাণ ভ'রে।
ক্ষুধা তোমায় দিলেন বিধি সুধা আগেই দান ক'রে।
গাইছে পাখী কুঞ্জবনে সে গান শোনো আপন মনে
চাঁদের আলোয় আলোয় বেড়াও রাতদুপুরে প্রান্তরে।

বনেবনে যে ফুল ফোটে প্রাণ তোষে তা মন তোষে।
ভোগবতী প্রকৃতির দান,—সম্ভোগে রও সন্তোষে।
মুক্ত গায়ে বটের ছায়ে জুড়াও জীবন মলয় বায়ে
হেলায় যদি বেলাই কাটে, মরবে সাঁঝে আফসোশে।

দিন ফুরালে নামলে আঁধার তাতে তোমার ভাবনা কি!
যা হ'বার তা হচ্ছে হবে জীবনটা ভাই নয় ফাঁকি।
থাকবে কেন জ্যান্তে মবা? চলবে ধরায় ভাঙন গড়া
শাস্ত্র পুঁথি আউড়ে বৃথা তার সমাধান হয় না কি?

শাসন শিকল সেধে পরে যে সব মানুষ মন-মরা।
তারাই কেবল টিট্‌কারী দেয় কর্‌বে হাসি মস্‌করা।
ভোগের বিচার থাক পড়ে থাক তৃষ্ণা মিটাও কণ্ঠ জুড়াক,
যোগীর ভোগীর একদশা ভাই, সবই হ'রে নেয় জরা।

উষাসূক্ত

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

[ঋগ্‌-বেদ; তৃতীয় মন্ডল, ৬১ সংখ্যক সূক্ত]

তুমি অন্নদা তুমিই ধনদা, হে উদিতা ঊষাদেবী!
আমরা তোমার সেবা করি এই গাহিয়া তোমার স্তব;
সকল দেবের বরণীয় তুমি; আজি এ যজ্ঞভূমে
হে দেবী পুরাণী, হে চির-যুবতী, হোক তব আগমন।

তুমি পথ চল সুবর্ণরথে হে দেবী অমৃতময়ী!
বাক্য তোমার প্রিয় ও সত্য; দীপ্ত সূর্যালোকে
অরুণবর্ণ তোমার রথের প্রবল-শক্তি-যুত
অশ্বেরা চলে উদয় হইতে অস্তাচলের পথে।

ওগো ঊষাদেবী! তব রথচূড়ে অমৃত-কেতন উড়ে;
সম্মুখে তব বিশ্বভুবন, সীমাহীন তা'র পথ;
চক্র-মার্গে প্রতিদিন দেখি তোমার আবর্তন;
পুরাতন পথে প্রতিদিন তব নূতন আবির্ভাব।

প্রতিদিন তুমি ত্যাগ কর এই অন্ধকারের বাস;
প্রতিদিন তুমি কর পরিধান আলোর বসনখানি;
তার পর এস বধূটির মত সূর্য-বাসর-গেহে;
স্বর্গকে তুমি কর প্রাণবান্, আমাদের ভাঙ ঘুম।

ওই আসে ঊষা, হে হোতৃগণ! জানাও নমস্কার;
সুশোভন হ'ক আমাদের স্তুতি; আকাশ আলোয় ভরা;
পূর্ব আকাশে শোভিছেন ঊষা বাক্যে যাঁহার মধু;
সব জীবলোক গেয়ে উঠে গীত তাঁহাতে লভিয়া প্রাণ।

তাঁর আগমনে আকাশ জেগেছে আঁধার-বসন ঠেলি;
ধনবতী ঊষা স্বর্গ মর্ত্য করেছেন আলোকিত;
হে অগ্নি! তাঁর আবাহন কর ঢালি হবি-সম্ভার;
তিনি সত্যদা তিনিই ধনদা, গাও তাঁর জয়গান।

দুটি গান

সংকেত

দিলীপকুমার রায়

রূপ দেখে যে নয়ন ভোলে—বিভোর, তুমি ভোলাও ব'লে।
ফুলের হাসি অমল কেন?—শ্যামল যে তার হাসে কোলে।
গাছের পাতা রাঙা এমন তোমার অধর ক'রে বরণ,
শাখায় কেন শিহর?—তোমার কাঁপনই যে সেথায় দোলে...
রূপ অপরূপ কেন?—তোমার অরূপ সেথায় লুকিয়ে ব'লে।

আশা কাঁদে অশান্ত—না পেয়ে কান্ত, তোমার দিশা।
তোমার অরুণ নেই যেখানে—ছায় সেখানে করুণ নিশা।
দীপ্তি সেথায় দেখি কালো লুপ্ত যেথায় তোমার আলো...
তোমার পানে যেই চায় প্রাণ—সূর্যমুখী ওঠে জ্বলে...
রূপের শোভাযাত্রা চলে অরূপেরি চতুর্দোলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

একলা পথের পান্থ হ'য়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে।
"বাসলে ভালো মিলবে আলো সব পথেই"—এ-মন্ত্র দিলে।
কাটলে বাঁধন পরতে রাখী, তোমায় বলে কে বৈরাগী?
প্রাণ-মৃণালে যার ফুটে নীলকমল—প্রেমের মন্দানিলে ঃ
ছাড়লে নিখিল ছড়িয়ে দিতে নিখিলনাথে এ-নিখিলে।

অঢেল মেলে মুগ্ধ মুনি, যশের যোগী শক্তি-অধীর,
কোটির মাঝে গুটিক মেলে আত্মভোলা প্রেমের ফকির।
তাই তো হ'য়ে সর্বহারা ভাঙলে পলে পাষাণ-কারা ঃ
অহঙ্কারের মরণ সেধে অমরণীর গান গাহিলে
সবার তরেই—আপন পরের সীমারেখার দাগ মুছিলে।

পুনর্বাসন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শোন সুনন্দা, ভুলে যাও তুমি চণ্ডীপুরের ঘর
ঘর ছেড়ে এসে এই তো হেথায় গড়েছি নূতন গ্রাম,
নিজ হাতে ছাওয়া ছোট ঘরখানি দেখায় কী সুন্দর
শ্রমদান ক'রে রেখেছি আমরা বাঙলাদেশের নাম।
ক্ষেতে ও খামাবে লক্ষ্মী মায়ের হাসি উঠিয়াছে ফুটে
ঘরের লক্ষ্মী তুমি সুনন্দা আলপনা দাও ঘবে,
গোলায় তুলেছি নূতন ধান্য দিনবাত খেটে-খুটে
পুরানো দিনের সুখের ব্যথায় কেঁদো না অমন ক'রে।

বহুদিন পবে অন্নহীনের ঘরে নবান্ন হবে।
বহুদিন পরে গৃহহারাদের গৃহে হবে উৎসব।
বহুদিন পরে জাগিবে হর্ষ শিশুদের কলরবে।
ভুলে যাও তুমি হারানো দিনের সংসার বৈভব।
নূতন গ্রামের পথে পথে আজ বহু মানুষের ভিড়
বুকে হাত রেখে আঁধার রাত্রি জাগিয়া কাটাল যারা
তাদের হাতের হাতুড়ির ঘায় পাথরে ধরেছে চিড়
জঙ্গল কেটে নূতন পথের পত্তন করে তারা।

তুমি কি জানো না, দেখ নি কি তুমি বলিষ্ঠ বাহুবলে
পতিত জমিতে লাঙল চালিয়ে বীচন বুনেছে কারা?

বাঙলার মাটি স্নেহলাবণ্যে ঢেকেছে শ্যামাঞ্চলে
ক্ষত-বিক্ষত জীবন কাদের? হয়ো না আত্মহারা।
ঝাঁপি খুলে দেখ, সোনা দিয়ে মোড়া শঙ্খবলয় দু'টি
শাশুড়ীর দেওয়া সিঁদুর কৌটা, এয়োতির লক্ষণ
পর' পর' আজ সিঁথিতে সিঁদুর, নয়নে উঠুক ফুটি
বিস্মৃতপ্রায় স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুন্দর সুশোভন।

সোনার ফসলে ভ'রে দেব গোলা, গৃহের লক্ষ্মী তুমি
আয় বরকতে আগামী দিনের শ্রীমন্ত সংসারে,
তুমি দিবে আশা ভালবাসা; আর জননী জন্মভূমি
চির পবিত্র মাটির স্পর্শে আমাদের দু'জনারে
ধন্য করিবে, সার্থক হবে নূতন গ্রামের নাম
সুনন্দা, শুধু তুমি দিয়ে যাও উৎসাহ অবিরাম।

রবীন্দ্রনাথ

কৃষ্ণদয়াল বসু

সেদিন স্বপনে দেখিনু গোপনে কবিরে গভীর রাতে
শ্রাবণ পূর্ণিমাতে,
চিরদিনকার বীণাখানি তাঁর হাতে।
শুধালেম—"কবিগুরু,
অজানার পথে যাত্রা তোমার এবার হ'ল কি শুরু?"
কহিলেন কবি—নিখিলের কানে কানে
বাজিল সে বাণী বীণার করুণ তানে,
ভেসে গেল সুর সুদূর পথের শেষে
দিগন্তে যেথা মেশে অনন্ত এসে—
"আমি কবি, আমি র'ব না, তবুও জেনো চিরদিন র'ব।
আমি রবি, চির গগনে গগনে আমি যে নিত্য নব।"

কাঁদিয়া কহিনু—"আকাশে আকাশে আঁকা সে আলোর ছবি,
জানি তুমি সেই রবি,
চিরদিনকার তুমি বীণকার, কবি!
তবু মন মানে না যে,
তোমার বিরহ সে-যে দুঃসহ অহরহ বুকে বাজে।"

কহিলেন কবি—"আবার আসিব ফিরে
এই ধরণীর অশ্রুনদীর তীরে।
ম্লান মূক মুখে ফুটায়ে তুলিতে ভাষা,
ব্যথাতুর বুকে জাগায় তুলিতে আশা,
আমি কবি, আমি যুগে যুগে হেথা নূতন জন্ম ল'ব।
আমি রবি, নিতি উদয়ে বিলয়ে নিত্য নবীন র'ব।"

শিশুর স্বপনে, কিশোরের মনে, চির-তরুণের বুকে,
জননীর হাসিমুখে
চির দিনযামী জেগে র'ব আমি সুখে।
নীরবে আসিব নেমে
বিরহে মিলনে হাসি-ক্রন্দনে স্নেহে করুণায় প্রেমে
বন্ধুব পথে চলে যাব কোন দূরে,
ফিরে দেখা হলে চিনিবে কি বন্ধুরে?
মনে ছিল আশা, ভালোবাসা পাই আরো।
ভুলে যেয়ো, যদি আমারে ভুলিতে পারো।
আমি কবি, আমি মরিতে চাহিনি এ কাহিনী কারে ক'ব।
আমি রবি, নিতি নূতন প্রভাতে উজলিব নব নভ॥

আশা তাই মনে আবার স্বপনে কবিরে দেখিবে রাতে
শারদ পূর্ণিমাতে,
কভু মধুমাসে কুসুম-সুবাসে প্রাতে।
নিখিল বীণার তানে
শুনিবে কবির যে বীণা গভীর বেজে ওঠে গানে গানে।
প্রেমের আসনে বরণ করেছ যারে
মরণ কি তারে হরণ করিতে পারে?
চির-স্মরণে অশ্রু-সাগর পারে
সে-যে তরী বেয়ে আসিবেই বারে বারে।
আমি সেই কবি, আঁধারে আলোকে চিরদিন সাথে র'ব।
আমি সেই রবি, নব নব লোকে নিত্য পুনর্নব॥

বেদে

কৃষ্ণধন দে

দড়ি-দড়া-ঝুড়ি-টিন-বাঁশ-তাঁবু-পেঁটরায়,
ডুগ্‌ডুগি-খঞ্জনি-ঢোলকের ঢেঁটরায়,
বন-মানুষের হাড়, মরা শকুনের আঁত,
সাদা বাদুড়ের ডানা, শাঁখামুঠি-বিষদাঁত,
শ্মশানের পোড়ামাটি, শিকড়ের ঝুলি আর,—
পথে পথে চলে ওরা নিয়ে বেদে-সংসার;
দল বেঁধে থাকে সব, যেথা যায় প্রাণ চায়,
মেয়েগুলো ঘোরে ফেরে রঙদার ঘাঘরায়।

কুকুর ছাগল হাঁস মুরগীও সাথী তাই,
বাঁকে ঝোলে হাঁড়িকুঁড়ি, তাঁবু গাড়ে সব ঠাঁই;
ঝাড়ফুঁক তুক্‌তাক্ জানে ভানুমতী-খেল্,
আছে কুমীরের দাঁত, ধনাই পাখির তেল,
হাত দেখে বলে দেয়—কোথা যশ, অপযশ,—
মনের মানুষ টানে শিকড়েতে করি বশ;
ঘরভাঙা, ঘরবাঁধা, মারণ ও উচাটন,
সবকিছু জানে ওরা যখন যা প্রয়োজন;
ট্যারা-চোখো বুড়ো বেদে, ঝানু বুড়ী বউ তার,
মিটিমিটি হাসে শুধু খুক্‌খুক্ কাসে আর!

মেঘ-কালো আকাশের নীচে বসে গালে-হাত,
ঘুমহারা চোখে বুড়ো কি যে ভাবে সারারাত,
কত গ্রাম দেখেছে সে, কত গিরি, নদীপথ,
কত বন, কত মরু, সাগরের সৈকত;
জানে না সে পথচলা কবে তার হবে শেষ,
মরণের শেষ-ঘুমে ডেকে নেবে কোন্ দেশ!
যে মাটিতে কিছুদিন ওরা এসে বাঁধে ঘর,
সে মাটির মায়া যেন ভরে থাকে অন্তর।
তবু ছেড়ে যেতে হবে,—যাযাবর ওরা, তাই—
চলাপথে দেখে নেবে পৃথিবীর শেষটাই!

দুইটি সত্যবাণী

জীবনানন্দ দাস

(১)

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যাবা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা।
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদেব সুপবামর্শ ছাড়া
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা,
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদেব হৃদয়।

(২)

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর? কেন মিছে
জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে সোনার ময়ূব-পঙ্খী
অশ্বত্থের শাখার পিছনে?
কেন ধুলো সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে, শিশিরেব চুমো খেয়ে
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ?
খঞ্জনারা কেন নাচে? বুলবুলি দুর্গা টুনটুনি কেন
ওড়াউড়ি করে বনে বনে?
আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত—ঘাঁটি বাঁধি
ভালোবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস!
ঘাস যে বুটের নীচে ঘাস শুধু—আর কিছু নয়
আহা—মোটর যে সব চেয়ে বড় এই মানবজীবনে।
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর
কিংবা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে?

জীবন-বন্দনা

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে!
বন্য-শ্বাপদসঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিত মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী ল'য়ে।
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
—তারাই গাহিল নব প্রেমগান ধরণী-মেরীর যিশু—
যাহাদের চলা লেগে
উল্কাব মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে!
খেয়াল-খুশীতে কাটি' অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংসসাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
নবীন-আবেগ রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধতশির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে!
তবুও থামে না যৌবনবেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্রে মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফেরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মরু-কবি গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাবসম কোন বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপমণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে!

শাতিল আরব

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী, মেস্‌রী, আর্‌বী, কেনানী,—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্‌ বেদুঈন্‌দের চাঙ্গা শির!
—নাঙ্গা-শির!
শম্‌শের হাতে, আঁশু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!
দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক আজমে করেছ ধন্যা;
বীর-প্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দ্দমীর!
মর্দ্দ বীর!—
সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির!
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
দুশ্‌মন-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্‌-মিল্‌,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
—জিন্দা বীব!
জুল্‌ফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত্‌ আলীর—
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।
ললাগে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা,—
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর!
—খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জ্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী!—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর?
—রক্ত-ক্ষীর!—
পরাধীনা!—একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু-ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

বিদগ্ধ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দিত শ্রবণ-যুগল
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম! ইতিহাস, গণিত, ভূগোল,
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে!

'প্রবেশিকা' সীমা রেখা অতিক্রম পিতৃ-পুণ্যফলে
'নলেজ'-লোলুপ হয়ে উত্তরিনু কলেজ-প্রাসাদে
নানাবিধ ভাব সেথা জুটিয়া কহিল দলে দলে,
"মস্তিষ্ক-কোটরে ওরে অবিলম্বে মোদের বাসা দে।"

আমি অতি ক্ষুদ্র নর—ক্ষুদ্রতর মস্তিষ্ক আমার,
তারি মাঝে ভাব-বৃন্দ বসিলেন গাদাগাদি করি;
চকিতে ফলিল ফল!—বুক ফাঁক হইল জামার,
পাদুকার চাকচিক্যে দর্পণ কহিল, মরি মরি!

দেশ-প্রেম, রুষ-প্রেম, চর্চা করি নানারূপ প্রেম
রাজা ও উজির কত মারিতেছে হয়ে এক জোট;
সহসা মরিল পিতা! সঙ্গে সঙ্গে এবং (ও, শেম!)
পরীক্ষায় ফেল করি পাইলাম নিদারুণ চোট।

ক্রমশঃ বুঝিতে হ'ল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতা
পিওনের ঘন ঘন আনাগোনা থেমে গেল সব;
চতুর্দিক হতে লভি বহুবিধ উপদেশ-গুঁতা
'নোট'—ভেলা 'পরে চড়ি 'পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব!

অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধূ ধূ বালুরাশি
শ্রমক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধার খাবার,
শিরপরে ভাব-গুচ্ছ কলেজে যা জুটেছিল আসি
দ্বীপবাসী বৃদ্ধসম তাড়না করিছে বারংবার।

সিন্দবাদ সম মোর নাহি বীর্য নাহি বুদ্ধি বল,
ভাব ভাবনার ভার বহিতেছি পিঠে চিরকাল;
ক্ষুধা-খিন্ন দুর্বলের একমাত্র ডিগ্রীটি সম্বল
তাই লয়ে খুঁজিতেছি 'wanted' সন্ধ্যা ও সকাল।

নারায়ণ

সজনীকান্ত দাস

অন্ধতার আবরণ বিদারি বিজ্ঞান-শলাকায়
সুনিপুণ হস্ত যাঁর প্রকাশিল নব সূর্যালোকে—
লভি নয়নের জ্যোতি তাঁর প্রতি নতি মোর ধায়,
অবারিত দৃষ্টি মোর দিনে দিনে দূরগামী হোক।
তমসা-আচ্ছন্ন আঁখি যা দেখেছে কটু ও কষায়
চারিদিকে যা দেখিয়া ভেবেছিনু অন্ধ হোক চোখ,
নবীন দর্শন লভি চিত্ত মোর প্রার্থনা জানায়—
সুন্দর হউক ধরা মানুষেরা হোক বীতশোক।
বহুদিন ভুলেছিনু পৃথিবীতে এত আছে আলো,
যত আলো এ আকাশে এ মাটিতে তত ভালবাসা—
জড়ত্বের আবরণ মানুষের দেবত্ব ভুলালো,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচুক এ তম সর্বনাশা।
দরদী বিজ্ঞানী এসো, এ আঁধারে দৃষ্টি-দীপ জ্বালো,
আনন্দে হাসুক পৃথ্বী, দূরে হোক নিষ্ফল হতাশা॥

শ্রাবণ-বন্যা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সংকীর্ণ দিগন্ত-চক্র; অবলুপ্ত নিকট গগনে
পরিব্যাপ্ত পাংশুল সমতা;
অবিশ্রান্ত অবিরল বক্রধারা ঝরিছে সঘনে;
হাঁকে বজ্র বিস্মৃত মমতা;
প্লাবিত পথের পাশে আনত বঙ্কিম তরুবীথি
শিহরিছে প্রমত্ত ঝঞ্ঝায়; নিমজ্জিত প্রহরের বৃতি;
ভেদ নাই উষায় সন্ধ্যায়॥
পথস্থ কুটীর দ্বারে ভয়ে পান্থ নিয়েছে আশ্রয়;
সিক্ত গাভী ছুটে চলে গোঠে;
কপোত কুলায়ে কাঁপে; দাদুরী নীরব হয়ে রয়;
পুষ্পবুকে অশ্রু ভ'রে ওঠে;
নিষিক্ত স্তব্ধতা ভেদি, প্রলয়ের হুংকার-রণনে,
পরিপ্লুত নদীর কল্লোলে,
উন্মাদ শ্রাবণবন্যা ছুটে আসে ভৈরব নিঃস্বনে,
অবরুদ্ধ পরাণ-পল্বলে॥

মেরুর ডাক

প্রমথনাথ বিশী

আবার মোরে ডাক দিয়েছে তুষার-মেরু উত্তরে,
সে রব শুনে বিপদ গুণে কেমন ক'রে রই ঘরে!
ছাদের বাধা আলগা হ'ল ডাকছে তাঁবু ইঙ্গিতে
মেরুর পানে মরার টানে—রইব পড়ে কোন্ ডরে!
হিমের বায়ে মরণ-শাদা দিচ্ছি আমার পাল তুলে,
জাহাজগুলো ডাকছে আমায় রিক্ত শাখার মাস্তুলে,
জলের ঝাপট লাগছে আমার নিদাঘ-দাগা পঞ্জরে,
তাইতো কাঁদে পরাণ আমার, ঘাটের বাঁধন দেয় খুলে।
তীক্ষ্ন হ্রেষায় মৃত্যু-নেশায় পবন হাঁকে ভীমরবে,
উড়ছে কানাৎ টুটছে তাঁবু ঝঞ্ঝা বিপুল বয় যবে—
ফুরিয়ে এলো খাবার পুঁজি ছিন্ন আমার বস্ত্র গো,
মৃত্যু বুঝি মুচকে হাসে—না হয় মরণ তাই হবে।
তাই বলে কি রইব পড়ে বিষুব রেখার অন্তরে,
রুদ্র নিদাঘ জ্বালায় যেথা তপের আগুন মন্তরে?
ব্যর্থ হবে মেরুর সে গান ব্যর্থ হবে জয়গাথা,
মৃত্যু যেথা হাজার রূপে জমাট জলে সন্তরে!
সবুজ আভা বরফরাশি রয়গো সেথা দিক্ জুড়ে,
সিন্ধুঘোটক বিশাল দাঁতে তুষার মাটি খায় খুঁড়ে,
পেঙ্গুইনের পঙ্গুদলে বিজ্ঞ ভাবে রয় চেয়ে,
ঝাপ্‌টে ফেলে ডানার বরফ ক্বচিৎ পাখী যায় উড়ে!
দিগন্তেরি ধারাটুকুতে নিতেজ রবি যায় দেখা,
হাজার তারার দ্বিগুণ আলো তুষার মেঝেয় হয় লেখা,
স্থির চপলা মেরুপ্রভা জ্বালায় রঙের ফুলঝুরি—
কার যেন এ শবসাধনা চলছে দিবারাত একা!
আবার ডাকে শোন্ গো তোরা, শোন্ গো তোরা কান পেতে,
আমায় ঘিরে রাখিস্ মিছে মেরুর মুখে দিস্ যেতে!
তরীর কাছি তীরের কাছে চাচ্ছে এবার মুক্তি গো,
প্রলয় শ্বাসে পাল ফেলেরে উঠছে তরীর হাল মেতে!
এবার আমায় ডাক দিয়েছে তুষারমেরু উত্তরে
চক্ষে যে দেশ হয়নি দেখা কাঁদছে পরাণ তার তরে—
শ্যামল ধরার কোমল বাহু লাগছে না আর মোর ভালো,
মেরুর পানে ভাসবো এবার মরণ-শাদা পালভরে।

কোপাই

প্রমথনাথ বিশী

হে কোপাই, তব তীরতরুচ্ছায়াতলে
এই কোলাহল হ'তে দিয়ো মোরে ঠাঁই।
তোমার অমৃত-স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন জলে
সভ্যতার হলাহল ধুয়ে যেন যাই।
তোমার কৌমুদীশুভ্র বালুকার তটে
তব তীরে জম্বুবন-পল্লব-অঞ্চলে,
তব শিরে অচঞ্চল নীলাম্বর পটে,
তোমার বালুকাশায়ী মন্দগতি জলে,
যে শান্তি হেরেছি আমি যে মধু-জীবন
যে মহা পূর্ণতাখানি পেয়েছে বিস্তার—
সে মোর ছাপায়ে দেহ ভরিয়াছে মন,
তুলেছে বীণায় মোর অপূর্ব ঝঙ্কার।
একবার মনে হয় লোকালয় ছাড়ি
তোমার নির্জনতীরে দিতে হবে পাড়ি।

মনে পড়ে

সুনির্মল বসু

মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি অনাবিল,
উশ্রী নদীর জল করে ঝিলমিল;
দুই তীরে উঁচু ডাঙা, ধারগুলো ভাঙা-ভাঙা,
বালুচরে ছায়া ফেলে' উড়ে যায় চিল।

ঝিরি ঝিরি কাঁপে পাতা, দোলে শালবন,
পলাশ-শাখায় আসে রঙের প্লাবন।
আমলকি বনে বনে ছায়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
শির্‌শির ক'রে ওঠে 'শিরশিয়া' ঝিল।

বনের আড়ালে খাড়া ঝাপসা পাহাড়,—
মাথায় কখনো হেরি মেঘের বাহার;
ছবির মতই আঁকা মেঠো-পথ আঁকা-বাঁকা
মাদল বাজিয়ে চলে সাঁওতাল-ভীল।

কোথা গেল সেই সব হারানো দিবস,
ভেবে ভেবে মন মোর হয় যে বিবশ।
মনে পড়ে অবিরত কত কথা শত শত,
আসা-যাওয়া করে সেই স্মৃতির মিছিল॥

রূপাই

জসীমউদ্‌দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখে কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল?
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া!
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু'খান সরু;
গা-খানি তা'র শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু!
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গা মাখিয়ে গেছে তেল,
বিজ্‌লি-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল!
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।
কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

সোনায় যেজন সোনা বানায়, কিসের গরব তার;
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যেজন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদরজের লাগি' লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক!
যে-কালো তা'র মাঠের ধান, যে-কালো তা'র গাঁও
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।
আখ্‌ড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।

'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী' বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে
বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয়, ও 'পাগাল' লোহা যেন!"
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।"

ভাড়াটে কুঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভাড়াটে কুঠি!
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি।

ওধারে তাহারা এধারে কাহারা ওপবে ও নীচে নানা;
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই—কেহ নয় কারো জানা!
শুধু দুবেলায় চোখাচোখি হয় একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি॥

ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে;
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি বধূটি শুকায়ে মরে।
নীচে মজলিসে সারাদিন গোল চলিছে দাবার ঘুঁটি।
ভাড়াটে কুঠি॥

একটি ইটের ব্যবধান রেখে পাশাপাশি থাকে শুয়ে,
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায় ভিৎ গাড়া একই ভুঁয়ে;
ওইখানে শেষ; তার পরে আঁটা জানালা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥

একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে, কোনখানে যাই ভেসে;
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায় নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥

শুধু কোনদিন সঙ্গ-বিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ,
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচেনা আড়াল, ব্যাকুল হৃদয় মিছে মরে মাথা কুটি॥
ভাড়াটে কুঠি॥

পুরানো কাগজের ফেরিওলা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হাঁকে ফেরিওলা—কাগজ-বিক্রি পুরানো কাগজ চাই।
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত তাড়াগুলি হাতড়াই।
পুরানো কাগজ চাই!
বহুদিন ধ'রে জঞ্জাল বাড়ে সের দরে বেচি তাই।

কেমন করিয়া একটি তাহার হঠাৎ নজরে পড়ে;
দেখি সমুদ্রে যাত্রী জাহাজ কোথায় ডুবিল ঝড়ে।
হঠাৎ নজরে পড়ে,
আবার কোথায় মানুষের মাথা বিকায় ধূলির দরে।

নিরুদ্দেশ কে সন্তান লাগি ঘোষিছে পুরস্কার;
মৃত্যুঞ্জয় অমৃত কারা করেছে আবিষ্কার।
ঘোষিছে পুরস্কার
পলাতক খুনে লুকায় কোথায় চাই যে হদিস্ তার।

কোন্ সে বধূর বুকের আগুন ভিতর করিয়া খাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার, পুড়ে গেল সাত-পাক।
ভিতর করিয়া খাক্,
কোন্ সে গিরির গরল অনলে ঘটিল দুর্বিপাক।

হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের পুরানো কাগজ পড়ি;
আমার নয়নে সহসা পোহায় সে দিনের বিভাবরী।
পুরানো কাগজ পড়ি,
রাখিল ধরণী সেই দিনটির পায়ের চিহ্ন ধরি।

সে পদচিহ্ন কোথায় মিলাল তার পরে নাহি খোঁজ।
মানুষের ঘরে সকলের বড় উৎসব নও-রোজ।
তার পরে নাই খোঁজ;
যাত্রী জাহাজে ডুবিল যে, বুঝি তারো ঘরে আজি ভোজ।

রক্তে ছোপানো অশ্রুতে ভেজা পুরাতন যত পাতা
সব জঞ্জাল আজকে, হ'লেও রঙীন সুতায় গাঁথা।
পুরাতন যত পাতা,
তাতে কোন্ দিন কি দাগ লাগিল কে বৃথা ঘামায় মাথা।

হাঁকে ফেরিওলা, কাগজ-বিক্রি, পুরানো কাগজ চাই।
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল জমাবার নাই ঠাঁই।
পুরানো কাগজ চাই;
আদর যাহার ফুরাল, তাহারে সের দরে বেচ' ভাই।

বিদ্রোহী

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সিন্ধু-বলাকার শ্রেণী চলে গেছে বহুক্ষণ দিগন্তের পারে,
বিহঙ্গের স্তব্ধ গীতি। দিবসের নির্বাপিত হোম কুণ্ড ধারে
পুরবীর কণ্ঠ শুনি, গায়ত্রীর রূপ-চ্ছন্দা যজ্ঞটীকা পরি'
মন্ত্র পাঠ করে একা, আনন্দের পুষ্পদল ফোটে চিত্তভরি।
সপ্তর্ষির জ্যোতিঃপুঞ্জে জাগে নাই নীলাম্বরে, অন্ধকার ছবি
ধরিত্রীর মর্মে রহে, বসে আছি উপকূলে, বিদ্রোহের কবি!
শান্ত হও, আর কেন? হৃদয়ের সন্ধি ক'র অনন্তের সনে,
কেন তুমি রুদ্ররূপে আনিয়াছ উন্মাদনা ধূর্জটির মনে!
অন্তহীন দ্বন্দ্ব তব চলিয়াছে অবিশ্রান্ত অসীমের মাঝে
নিত্য মহাকাল সাথে। কি বেদনা বক্ষে তব নিশিদিন বাজে
কহ তাহা, হে চঞ্চল! তব নীল তরঙ্গের উন্মাদনা রাখি
ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল। দিবসের হোমাগ্নির ভস্ম দেহে মাখি
এস মোরা সন্ধ্যাজপে দেবতার নাম নিয়া ধ্যান করি চুপে,
অশান্তির উদ্দীপনা রাখো তব, সুনির্মল! রহ সৌম্যরূপে।

মঞ্জীর

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুলিতে চাহিনা যশের মুক্তাহারে,
মুকুটে জ্বলিতে নাহি মোর সাধ নাহি।
সকলের নীচে তুমি দে'ছ ঠাঁই যারে
আমি তব সেই মঞ্জীর হ'তে চাহি।

ধরার ধূলায় যত কাছাকাছি থাকি
সেই মোর ভালো, সেই মোর সম্মান।
তব ইঙ্গিতে স্পন্দি' উঠিব ডাকি,'
তব পদপাতে বাজিবে আমার প্রাণ।

কভু অতি মৃদু মঞ্জুল শিঞ্জনে
এ তনুতে বাণী রণিবে কলস্বনা,
কভু-বা ধ্বনিবে,—দেবী, তব প্রয়োজনে,—
দ্রুততালে তুলি' ঘনঘোর ঝঞ্ঝনা।

জননী, তোমার রাতুল চরণ চুমি,
তোমার ছন্দে ভরিব আমার ভাষা
যতদিন মোর বিকল এ দেহ তুমি
না ফেলিবে দূরে—এই শুধু মোর আশা।

জয়তু আফ্রিকা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মৌন মহারণ্যে জাগে নব জীবনের আলো ঝলমল প্রভাত!
জাগে গণতন্ত্রের গরিমাময়ী উষা!
আফ্রিকা, ভারতের কবি
একদা তোমাকে বলেছিল, "মান-হারা মানবী"।
সেই মান-হারা মানবীর উন্নত শিরে
আজ বিজয়িনীর মুকুটমণির জ্যোতিঃ।
আফ্রিকা, তোমার এই মহাজাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্তে
গ্রহণ করো নগণ্য এক বাঙালীকবির অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য।

নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদ অর্থলালসায় উন্মত্ত হ'য়ে
দলিত মথিত করেছে তোমার হৃদয়,
দুঃসহ দুঃখের সুতীক্ষ্ণ হলমুখে
দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়েছে তোমার প্রাণ।
কে জান্‌তো সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রন্ধ্রপথে
একদা বেরিয়ে আসবে নূতন প্রাণের শ্যামাঙ্কুর!
দেখতে পাচ্ছি, একটা দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের
জয়যাত্রা সুরু হয়েছে তোমার দিগ্‌দিগন্তে।
এই দিগন্তপ্রসারী অভিযানকে আমি
অভিনন্দিত করি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে।

সুদূর সমুদ্র হ'তে কখন এলো নরশিকারীর দল!
ওদের ক্ষুধিত চোখের শাণিত দৃষ্টিতে
লালসার লেলিহান শিখা!
তোমার নিস্তব্ধ অরণ্যের মৃগপক্ষীদের সচকিত
করে মুহুর্মুহু গর্জাতে লাগলো ওদের আগ্নেয়াস্ত্র;
স্বচ্ছন্দবিহারী বন্য-কুঞ্জরেরা ধূলায় পড়লো লুটিয়ে।
গজদন্তের পাহাড় জমতে লাগলো
লোভাতুর বণিকদের কুঠিতে কুঠিতে!
লোভ ওদের গজদন্তে সীমাবদ্ধ রইল না।
নরশিকারীরা জীবন্ত মানুষকে পরিণত করলো পণ্যদ্রব্যে
মানুষের জীবন নিয়ে চল্‌তে লাগলো ছিনিমিনি খেলা!

আর্তনাদ উঠ্‌লো নদীতীরের শান্ত লোকালয়ে লোকালয়ে,
শ্যামল বনভূমির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় নিগ্রোদের কুটিরে কুটিরে,
ধ্যানগম্ভীর পর্বতমালার নিদ্রাতুর উপত্যকায় উপত্যাকায়।
লাঞ্ছিত নরদেবতার মর্মভেদী হাহাকারে
প্রাচীন মহাদেশের আকাশ উঠলো মুখর হ'য়ে।
বাণিজ্য-তরণীগুলি চলেছে আফ্রিকা থেকে
নূতন মহাদেশের উপকূলে,
জাহাজ ভর্তি শিকলে বাঁধা নর-নারী যেন বলির পশু।
ভয়ার্ত পশুপাল চলেছে কোন্
নিষ্ঠুর রাজার যজ্ঞভূমিতে প্রাণ দিতে;
ওদের ভীতিবিহ্বল চোখে কিসের বিভীষিকা?
ওদের মনে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দেয় পিছনে
ফেলে-আসা স্বাধীন জীবনের সোনালি ছবি।
হীরের লোভে কাতারে কাতারে আসতে লাগলো
স্বার্থপিশাচ মুনাফাখোরের দল!
ভগবান যাদের মানুষ ক'রে তৈরী করেছিলেন
তারা হ'য়ে গেল খনির কুলি!
নরনারায়ণ পর্যবসিত হোলো পণ্য বস্তুতে।
সিগার শ্যাম্পেন আর মোটরের উদগ্র লোভ দেখিয়ে
ভাই ভাইকে পরিণত করলো সহায়-সম্বলহীন ক্রীতদাসে!

দরিদ্রের রুধিরে ফেঁপে উঠ্‌লো স্বর্ণপাগলদের ঐশ্বর্য।
রাবণের মৃত্যুবাণ ছিল রাবণেরই ঘরে!
পশ্চিমেরও মৃত্যুবাণ তৈরী হ'তে
লাগলো পশ্চিমেরই অন্তঃপুরে।
অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ তৈরী করতে লাগলো
আফ্রিকার ভাবী বিপ্লবকে স্তন্যরস দিয়ে।
পশ্চিমী ভাবধারার স্তন্যরস পান ক'রে
প্রস্তুত হোলো যাদের মন
তারা একে একে ফিরে এলো ঘরে!
তাদের হাতে যুগান্তরের জয়ধ্বজা,
চোখে স্বাধীন আফ্রিকার স্বপ্ন,
কণ্ঠে সাম্যের আর মৈত্রীর প্রশস্তি!
তাদের আত্মায় আফ্রিকা, মগজে ইউরোপ।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সঙ্গমে দাঁড়িয়ে
তারা ডাক দিলো, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।
প্রাণের আহ্বানে প্রাণ দিলো সাড়া।
যুগ-যুগান্তের জড়তা থেকে জাগে মানহারা মানবী,
জাগে নাক্রুমার ঘানা আর লুলুম্বার কঙ্গো!
জাগে আল্‌জিরিয়া, টিউনিসিয়া, গিনি, নিয়াসাল্যান্ড
রোডেসিয়া, লাইবেরিয়া, নাইজিরিয়া, সোমালিল্যান্ড।

অত্যাচারীরা দিগন্তে মিলিয়ে যায় কুয়াশার মতো।
স্বাধীনতা অমর! সাম্য চিরজীবি! গণতন্ত্র মৃত্যুঞ্জয়,
আফ্রিকা, তোমার নবজন্মের এই প্রভাতে
আবার গ্রহণ করো আমার প্রণাম॥

সনেট

হুমায়ুন কবির

ক্ষান্ত কর অতীতের পুরাতন গৌরবের কথা।
সে কাহিনী আরবার শুনিবার নাই কোন সাধ।
স্মৃতি তার আজি শুধু চিত্ত ভরি জাগায় তিক্ততা,
ক্রূর কণ্ঠে বর্তমান তারে শুধু দেয় অপবাদ।
সুদূর অতীতে যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা
ভুবনে রচিয়া থাকে সভ্যতার নব ইতিহাস,
বঞ্চিত ক্ষুধিত এই দাসত্বের অপমানে ঘেরা
মোদের জীবনে মেলে স্বপ্নেও কি তাহার আভাস?

সে কাহিনী মিথ্যা আজি। মিথ্যা তারে করেছি আমরা।
যে ঐশ্বর্য ছিল সেথা তারে মোরা করিয়াছি ক্ষয়
আমাদের জীবনের দৈন্য দিয়া তীব্র ক্ষুধা দিয়া।
আপন পৌরুষ দিয়া যদি পারি করিবারে জয়
সে গৌবব পুনর্বার, অন্তরের অনলে দহিয়া
রচিব ভারতবর্ষে মানবের স্বপ্নের অমরা।

শেষরাতের বাদল

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ রাত্ থেকে নেমেছে বাদল, পিছল হয়েছে পথ-ঘাট,
জল থই থই ডোবায় পুকুরে, নির্জন আজ হাটবাট।
আকাশ ভরিল ঘন মেঘে, হ'ল হৃদয় মিলন-উন্মুখ,
গুরু গুরু কাঁপে আকাশের হিয়া, দুরু দুরু কাঁপে মোর বুক।

রাতের আঁধার কাটেনি তখনো, মেঘের আঁধার থম্‌থম্,
কত সোহাগিনী নিভৃত মিলনে, বাহিরে বাদল ঝম্‌ঝম্।
আমার কেবল কম্পিত চিত শঙ্কিত হিয়া ভাব্‌নায়
বিরহ-বেদনা ঘনাইয়া আসে গহন নিবিড় মেঘছায়।

শেষ রাত থেকে হাত দিনু কাজে, মন বসেনাকো কিছুতেই
পাঁচবার ডাকে তবে পশে কানে, আমাতে যেন সে আমি নেই।
শ্বাশুড়ী শুধান্ "অসুখ করেছে?" মন ভরে মোর লজ্জায়,
চোখে আসে জল, সারারাত শুধু কেঁদেছি শূন্য শয্যায়।

বাসন-কোসন ভারী লাগে যেন, শ্রান্ত এ তনু দুর্বল,
হেথায় হোথায় জমিয়াছে জল পথঘাট সব পিচ্ছল।
পুকুরের পাড়ে তাল-নারিকেল ভেজে ঝিম্‌ঝিম্ বাদ্‌লায়,
চেয়ে থাকি দূর ব্যথিত আকাশে, কত ব্যথা এসে মন ছায়।

কবে তাঁর মনে দিয়েছি বেদনা, কবে করেছিনু অভিমান,
তাই ভাবি, আর কাজ প'ড়ে রয়, বহিয়া চলেছে দিনমান।
ভিজে ভিজে শুধু ঘর আর ঘাট ঘুরিতেছি, কত হয় ভুল।
মনে নাহি পড়ে, কখন্ কোথায় ফেলেছি কানের দু'টো দুল্।

বনবুকে কাঁপে বেদনা-তিমির আঁখির কাজল ধুয়ে যায়,
কেতকীর প্রাণ শিহরে ব্যথায়, কামিনীর শাখা নুয়ে যায়।
পুকুরের জল করে থল্ থল্ শাপ্‌লা ফুটেছে বুকে তার,
তাল-নারিকেল-খর্জুর-শিরে ঘনায় মেঘের আঁধিয়ার।

চরৈবেতি

অজিত দত্ত

কীর্তির সীমা উত্তরণের পরে
অজ্ঞাতবাসে যাত্রারম্ভ করো,
রাজৈশ্বর্য পশ্চাত বন্দরে
ফেলে চলো খুঁজি রাজ্য বৃহত্তর।
জীবনের পুঁথি যতোটা হয়েছে পড়া
নতুন গ্রন্থে চলো খুঁজি তার মানে।
এসো শুরু করি নতুন কুটির গড়া—
স্থাপত্য যার বিশ্বকর্মা জানে।

পিরামিড্ আর সৌধের জঞ্জালে
দিগন্ত আজ অর্ধেক গেছে ঢাকা।
আকাশের রং ছেয়েছে ধোঁয়ার জালে,
পাঁকে বসে গেছে ধর্মরথের চাকা।
জীবন ঊহ্য জীবনের আয়োজনে,
প্রেমোপকরণে প্রেম অনুপস্থিত,
কীর্তির প্রেত রাজ্য ফেঁদেছে মনে,
বাক্যের জালে মগ্ন প্রাণের গীত।
কতো সম্পদ, কতো সোনা-রুপো-হীরে
জমেছে ঝাঁপিতে সারাদিন তাই গোনা,
এই অবসরে প্রেম এসে যায় ফিরে,
মুছে যায় ক্রমে হৃদয়ের আল্পনা।

চলো ফেলে দিই জীবনের জঞ্জাল,
নতুন মাটিতে নতুন ফসল বুনি,
পৃথিবী এখনো যৌবনে উত্তাল,
হৃদয়ে এখনো অপূর্ব ফাল্গুনী।
এখনো নয়নে নয়নের আলো খোঁজা,
জীবন-গড়ার এখনো সময় আছে,
দীর্ঘপথের সোনালী নুড়ির বোঝা
যতো ফেলে যাওয়া, মুক্তি ততোই কাছে॥

কেতকী

রাধারাণী দেবী

রজনীর কালো অঞ্চলে ঝাঁপা দিন,
রিনি রিনি ঝিনি বাজিছে ধারার বীণ।
বনপথ পাশে কণ্টক ঝোপ আড়ে
গোপন গন্ধে পথিকের মন কাড়ে,—
গোপনচারিণী কেয়া—
বাদলে এসেছে বাহিয়া সুরভি-খেয়া।

বাদলে এসেছে বাহিয়া সুরভি-খেয়া,
কাজরীর সনে মিটাইতে দেয়া-নেয়া।
জাগে ভুঁইচাঁপা সিক্ত সবুজ ঘাসে,
করতালি দিয়ে পাগলা বাতাস হাসে,
—লেগেছে বিপুল দ্বন্দ্ব,—
কে জিনিবে আজি,—শব্দ অথবা গন্ধ?

কে জিনিবে আজি,—শব্দ অথবা গন্ধ?
কেতকী কিংবা বারিধারা-ধ্বনি-ছন্দ?
সরমে লুকাল গোলাপ গন্ধরাজ,
অতসী কেতকী মরমে মেনেছে লাজ।
—ক্ষোভে মালঞ্চ ম্লান,—
সুরভি-গরব আজি তার অবসান।

সুরভি-গরব আজি তার অবসান—
ভেঙেছে কনকচম্পার অভিমান।
উদ্যানে কারো গন্ধ-গরব নাই—
মানে পরাজয় বনবাসিনীর ঠাঁই।
ঘন সৌরভে তার—
ধরণী আকাশ বুঝি হল একাকার।

ধরণী আকাশ বুঝি হল একাকার।
ঘ্রাণপথ দিয়া প্রাণে পাই দেখা তার।
মেঘ ডম্বরু ধারাখঞ্জনী ছেপে
কেতকীর জয়গন্ধ উঠিল ব্যেপে
গগনের তীরে তীরে।
গহন শ্রাবণ গাহে তাই ফিরে ফিরে।

আর কিছু নাহি সাধ

আর কিছু নাহি সাধ। জানি, মোর তরে নহে
জয়মাল্য যশের মুকুট;
বিশ্বের কবিরা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হয়ে
রজনীর শ্যামল অঞ্চলে—
সেথা মোর নাহি স্থান। আমার বন্দনা-গান
জাগিবে না নীল নভস্তলে;
মোর করস্পর্শ কভু লভিবে না শ্রদ্ধা-সিক্ত
অভিষেক-পল্লব-সম্পুট।
নর-চিত্ত-ভক্তি-তীর্থে নিত্য-স্বর্গ নহে মোর;
মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য। একবিংশ শতাব্দীর
কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে—
মনে জানি—পড়িবে না আমার কবিতাখানি
জ্যোৎস্না-স্নাত বাতায়ন-তলে;
সতীর্থের হৃদ্-পদ্মে গন্ধ-রূপে ক্ষণিকের
স্মৃতি-স্বপন—জানি, তাও ঝুট।

তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ
হৃদয়ের হিম-সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি। তোমারে যে পেয়েছিনু
সর্ব-অঙ্গে, মর্মে-মনে-প্রাণে,
পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে,
মিলনের প্রফুল্ল বাসরে;—
সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে,
তৃণপত্রে, সমুদ্রের কানে।
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার
একা-একা আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ
ক'রে যাই লক্ষ গানে—গানে।

নদী

সুধীর গুপ্ত

ঘন সবুজের শোভার ভিতরে, অরণ্যানীর মাঝে,
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে,
সমতল-পথে বহু হাট, বাট, জনপদ পার হ'য়ে,
চলেছি অনেক দূরে।
গাহন করিতে, গাগরী ভরিতে, ঘাটে কত রূপসীরা
করিয়াছে আনাগোনা,
নীল-নভ-চারী সোনার রবিও আমারে ভুলাতে, নীরে
ছড়ালো চিকণ সোনা।
সোনালী ধানের ঢেউ-লাগা মাঠে, তীর-তরু-ছায়ে কভু
রাখালের বাঁশী সুরে,
তট-রেখা চুমি' জল কল-গানে বলেছে দু'পারে তা'র
মরিব এবার ঝুরে।
বারিত হোলো না বারি-ধারা তবু, বাঁধন-বিহীন বেগে
চলিতেছি নিরবধি;
ঘু-ঘু-ডাকা তীর শান্তি-নিবিড় মোর তরে নয়—নয়
আমি মুসাফির নদী।
আকাশের চাঁদ আমার অতলে ডুবেছে অনেকবার,
ডুবেছে তপন, তারা,
আলো-ছায়া-ফাঁদে হেসেছি, খেলেছি অতি-প্রিয়জন সম,
হইনি তবুও হারা।
মাটির শিশুরা ঘাসের গালিচা দুই তীরে দেয় পাতি;
লতা-পাতা ফুলে-ফলে
সবুজ শাখীরা বোনে মায়াজাল—বাঁধনের জাল কত
ঝুঁকিয়া আমার জলে;
মহা-নগরীর নাগরিয়া-ভাবে হেসে হই কুটি কুটি;
হু-হু করে শুধু প্রাণ,
কোন্ মহানের মহিমায় যেন মন হ'য়ে থাকে ভোর;—
চলা তাই অ-ফুরান।
কূলের বাঁধন ক্ষয় ক'রে ক'রে চিরদিন শুধু চলি—
অল্পে যে সুখ নাই;
যাযাবর নদী জীবন ঢালিয়া পিপাসার টানে শুধু
অকূলে ভাসিয়া যাই।

পদ্মানদীর চর

দিনেশ দাশ

ফর্সা সাদা মেয়ের মত পদ্মানদীর চর
গায়েতে তার প্রজাপতির মতই ছোটঘর,
দু'পাশে তার সবুজ জমি, সকাল সন্ধ্যেবেলা
সোনালী জল মাছের মতই শুধুই করে খেলা।

ভেসে এলাম এ কোন্ দেশে কালের কালো ঝড়ে
মনের কপোত ঘুমায় তবু একটি ছোটঘরে,
ঘর নয় তো সে যেন এক মধুর মধু-চাক
সকাল হ'তেই গুনগুনোনি মৌমাছিদের ডাক।

পাতাল ফুঁড়ে বাজ ওঠে কি? কেউ শুনেছ ভাই?
হঠাৎ মাটি দু'খান হল, আগুন-রোশনাই
সাপের মত ছোবল তুলে কখন দিল হানা,
ফেলল গিলে সাতপুরুষের মাটির ভিটেখানা।

তখন হতে তরল রাঙা আগুন ওঠে ফুলে'
পদ্মানদীর সোনার দেহে সোনার এলোচুলে:
জলে-ডাঙায় ধোঁয়া আগুন রক্ত মাখামাখি—
জ্বলন্ত এক জঙ্গলেতে নীড়হারানো পাখি।

উড়ে এলাম ঝড়ের মুখে একটি ছোট বীজ
পায়ের নীচে পাথর ছাড়া যায় না কিছু দেখা,
কেমন ক'রে শিকড় মেলি সবুজ মাটি কই
পাথরেরই পাহাড় চূড়োয় দাঁড়িয়ে কাঁদি একা॥

ইলোরা

বিষ্ণু দে

আকাশে তোমার মুক্তি; যে-কৈলাস বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার ঊর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে-নৃত্যের সঙ্গিনী;
সেখানে নেইকো সোনা কৌটিল্যের নেই বিকিকিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।
সে—দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে,
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাদ্যরবে
পায়ে পায়ে পৃথ্বী জাগে সতী তোলে সর্বসংহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে,
রৌদ্রজলে ছায়াতপে বর্ষে-বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর।
আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে, নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর॥

বিরহ

হরপ্রসাদ মিত্র

বালুচর জবলে ধু ধু—সুদীর্ঘ সময়,
উড়ে গেছে শ্বেতপক্ষ যাযাবর পাখি!
আকাশে অবাধ শূন্য, আর কিছু নয়,
নির্লিপ্ত, অলস চোখে দূরে চেয়ে থাকি।

সবুজ ইশারা নেই তৃণহীন চরে।
জলের পশুর হাড় বিক্ষিপ্ত ধূলায়।
পিশাচীর হাসি-ধ্বনি বাতাসের স্বরে।
একাকী দর্শক আমি এ শিব-লীলায়॥

এখানে সমুদ্র ছিল নীলাম্বু নিথর
আদিম প্রাণের বন্যা নিবিড় নীলিমা।
এখানে সমুদ্র ছিল অগাধ, দুস্তর,
উছল জলের দীপ্ত, অশান্ত মহিমা!

তুমি চ'লে গেলে আর, সমুদ্র তো নয়—
বালুচর জ্বলে ধু ধু,—সুদীর্ঘ সময়!

লোকটা

গোপাল ভৌমিক

লোকটা বিস্ময় বটে, এই বৈশ্য যুগে
না করে বেসাতি, করে সে হৃদয় নিয়ে
মাতামাতি; অনাহারে রোগে ভুগে ভুগে
পাণ্ডুর দু' চোখ তার, তবু তাই দিয়ে

সে চায় দেখতে ওই দূরের আকাশে
কি করে ঘনায় সন্ধ্যা রৌদ্রমাখা
চিলের ডানায়, কি করে মেঘেরা ভাসে
রাত্রির বুকে যেন ছায়াছবি আঁকা।

মাটি মা'কে ভাল বাসে, তাই ঘাসে শুয়ে
ভাবে সে অনেক কথা, আকাশ পৃথিবী,
ভাবে সে কি করে মিলে দুয়ে আর দুয়ে
চার হয়; ওদিকে যে জমে উই ঢিবি

পরবাসী করে তাকে স্বদেশে স্বঘরে,
ভুলে সে থাকেই বসে হৃদয়-চত্বরে।

কাশ্মীর

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সেই বিশ্রী দম-আটকানো কুয়াশা আর নেই,
নেই সেই একটানা তুষার-বৃষ্টি, হঠাৎ জেগে উঠেছে—
সূর্যের ছোঁয়ায় চম্‌কে' উঠেছে ভূস্বর্গ।
দু'হাতে তুষারের পর্দা সরিয়ে ফেলে' মুঠো মুঠো
হল্‌দে পতাকা দিয়েছে উড়িয়ে, ডেকেছে রৌদ্রকে,
ডেকেছে তুষার-উড়িয়ে-নেওয়া বৈশাখী ঝড়কে,
পৃথিবীর নন্দন-কানন কাশ্মীর।
কাশ্মীরের সুন্দর মুখ কঠোর হলো প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে ঃ
গ'লে গ'লে পড়ছে বরফ—
ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে জীবনের স্পন্দন!
শ্যামল আর সমতল মাটির স্পর্শ লেগেছে ওর মুখে,
দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল—
আন্দোলিত শাল পাইন আর দেবদারুর বনে
ঝড়ের পক্ষে আজ সুস্পষ্ট সম্মতি!
কাশ্মীর আজ আর জমাট-বাঁধা বরফ নয়—
সূর্যকরোত্তাপে জাগা কঠোর গ্রীষ্মে
হাজার হাজার চঞ্চল স্রোত!
তাই আজ কালবৈশাখীর পতাকা উড়ছে
ক্ষুব্ধ কাশ্মীরের উদ্দাম হাওয়ায় হাওয়ায়;
দুলে দুলে উঠেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে
ঘুমন্ত নিস্তব্ধ বিরাট্‌ ব্যাপ্ত হিমালয়ের বুক॥